বামাবোধিনী পত্রিকা।

No 477-78 May & June, 1903.

BAMABODHINI PATRICA.

"কন্যাপ্যেবং পালনীয়া শিক্ষণীয়াতিযত্নতঃ"

কন্যাকে পালন করিবে ও যত্নের সহিত শিক্ষা দিবেক।

৪০ বর্ষ। ৪৭৭-৭৮ সংখ্যা। বৈশাখ ও জ্যৈষ্ঠ, ১৩১০। 1903-4. ৭ম কল্প। ৩য় ভাগ।

সংক্ষিপ্ত নূতন পঞ্জিকা।

বঙ্গাব্দ ১৩১০ সাল।

ইং ১৯০৩—১৯০৪।

শকাব্দা ১৮২৫।

সম্বৎ ১৯৬০—৬১।

ব্রাহ্মাব্দ ৭৪—৭৫।

*বৈ	জ্যৈ	আ	শ্রা	ভা	আ
ম	শু	ম	শু	ম	শু
৩১	৩২	৩১	৩২	৩১	৩০
†এ	মে	জুন	জু	আ	সে
‡১৪	১৫	১৬	১৭	১৮	১৮
বু	শু	সো	বু	শ	ম
৩০	৩১	৩০	৩১	৩১	৩০
বৃ	র	ম	শু	সো	বু

কা	অ	পৌ	মা	ফা	চৈ
র	ম	বু	শু	শ	সো
৩০	২৯	৩০	২৯	৩০	৩০
অ	ন	ডি	জা	ফে	মা
১৮	১৭	১৬	১৫	১৩	১৪
বৃ	র	ম	শু	সো	ম
৩১	৩০	৩১	৩১	২৯	৩১
শ	সো	বু	র	সো	বু

ম	শু	ম	শু	ম	শু	§১	৮	১৫	২২	২৯	র	ম	বু	শু	শ	সো
বু	শ	বু	শ	বৃ	শ	২	৯	১৬	২৩	৩০	সো	বু	বৃ	শ	র	ম
বৃ	র	বৃ	র	বৃ	র	৩	১০	১৭	২৪	৩১	ম	বৃ	শু	র	সো	বু
শু	সো	শু	সো	শু	সো	৪	১১	১৮	২৫	৩২	বু	শু	শ	সো	ম	বৃ
শ	ম	শ	ম	শ	ম	৫	১২	১৯	২৬		বৃ	শ	র	ম	বু	শু
র	বু	র	বু	র	বু	৬	১৩	২০	২৭		শু	র	সো	বু	বৃ	শ
সো	বৃ	সো	বৃ	সো	বৃ	৭	১৪	২১	২৮		শ	সো	ম	বৃ	শু	র

	বৈ	জ্যৈ	আ	শ্রা	ভা	আ
শুঃ এঃ,	২৪	২৩	২০	১৯	১৬	১৫
পূঃ,	২৮	২৭	২৪	২৩	২০	১৯
কৃঃ এঃ,	১০	৯	৬	৪	৩১	২৯
অঃ,	১৪	১২	১০	৮	৪	৬

শুঃ এঃ-শুক্ল একাদশী, পূঃ-পূর্ণিমা। কৃঃ এঃ-কৃষ্ণ একাদশী, অঃ-অমাবস্যা।

,,* পরীক্ষা-২৮এ বৈঃ সোমবার ও ২৭এ জ্যৈষ্ঠ বুধবার পূর্ণিমা। ১৪ই বৈশাখ সোমবার ও ১২ই জ্যৈষ্ঠ মঙ্গলবার অমাবস্যা।

* বৈ-বৈশাখ মঙ্গলবার আরম্ভ ও ৩১এ শেষ।

† এ-এপ্রেল বুধবার আরম্ভ ও ৩০এ বুধবার শেষ।

‡ ১৪ই এপ্রেল ১লা বৈশাখ, ১৫ই মে ১লা জ্যৈষ্ঠ ইত্যাদি।

§ ১লা বৈশাখ মঙ্গলবার, ২রা বুধবার ইত্যাদি। ১লা জ্যৈষ্ঠ শুক্রবার, ২রা শনিবার ইত্যাদি।

বৈ-মঙ্গল-১, ৮, ১৫, ২২, ২৯।
জ্যৈ-শুক্র-১, ৮, ১৫, ২২, ২৯।
এপ্রেল-বু-১, ৮, ১৫, ২২, ২৯।

এক এক দিকে ৬টী করিয়া দুই দিকে ১২টী স্তম্ভে ১২ মাসের গণনা।

	কা	অ	পৌ	মা	ফা	চৈ
শুঃ এঃ,	১৫	১৪	১২	১৩	১২	১৪
পূঃ,	১৯	১৮	১৯	১৮	১৯	১৮
কৃঃ এঃ,	২৯	২৮	২৯	২৯	২৯	২৯
অঃ,	৩	৩	৩	৩	২	৩

,,* পরীক্ষা-১৫ই কার্ত্তিক রবিবার ও ১৪ই অগ্রহায়ণ সোমবার শুক্ল একাদশী। ২৯এ কার্ত্তিক রবিবার, ২৮এ অগ্রহায়ণ সোমবার কৃষ্ণ একাদশী।

এইরূপ মধ্য স্তম্ভের সংখ্যার সহিত মাস ও বারের স্তম্ভ মিলাইয়া লইলে ... [illegible]

নব বর্ষ।

বামাবোধিনী পত্রিকা ৪০ বর্ষ অতিবাহন করিয়া নব বর্ষের মুখ দর্শন করিল, এজন্য সিদ্ধিদাতা মঙ্গলবিধাতার চরণে একান্ত ভক্তি ও কৃতজ্ঞতার সহিত আমরা প্রণাম করি। আগামী ভাদ্রমাস ইহার জন্ম-মাস, সেই মাসে ইহার শুভ জন্মোৎসব হইবে। আমরা বামাবোধিনীর আত্মীয় বন্ধুবান্ধব ও হিতৈষী হিতৈষিণী সকল ভ্রাতা ভগিনীকে সাদরে আহ্বান করিতেছি, সকলে এই পত্রিকার মঙ্গল প্রার্থনা করুন এবং যাহাতে ইহার ৪০ বার্ষিক জন্মোৎসব উপযুক্তরূপে সম্পন্ন হইতে পারে, তদ্বিষয়ে আমাদিগকে পরামর্শ ও সহায়তা দান করুন্। আমরা জানি বামাবোধিনীর প্রতি অনেক ভাই ভগিনীর আন্তরিক স্নেহ, যত্ন ও ভালবাসা আছে, তাহা না থাকিলে এই ক্ষুদ্র পত্রিকা কখনও এই সুদীর্ঘ জীবন লাভ করিতে পারিত না। বর্ত্তমান বর্ষ ইহার জীবনের বিশেষ স্মরণীয় বর্ষ এবং অনেক দিন হইতে আমরা ইহার প্রতীক্ষা করিতেছি। এই বর্ষে ইহাকে স্থায়ী করিবার উপায় করিতে পারিলে ইহার ৪০ জন্মোৎসব সার্থক হয়।

বামাবোধিনীকে স্থায়ী করিবার জন্য ৩টী কার্য্য অত্যাবশ্যক বলিয়া বোধ হয়। (১) ইহার জন্য একটী স্বতন্ত্র প্রেস; (২) একটী স্থায়ী ফণ্ড; (৩) একটী সুযোগ্য পরিচালক-সমিতি।

১।—বামাবোধিনীর প্রেসের জন্য আমরা কয়েকবার চেষ্টা করিয়াছিলাম, কিন্তু উপযুক্ত অর্থ সংগ্রহের আশা না দেখিয়া তাহা হইতে বিরত হই। এখন কি এ অভাব পূর্ণ করিয়া দিতে কেহ অগ্রসর হইতে পারেন? বামাবোধিনীর প্রেস হইলে কেবল বামাবোধিনী সুশৃঙ্খলে চলিবার উপায় হইতে পারে, তাহা নয়; স্ত্রীশিক্ষোপযোগী অনেক পুস্তক পুস্তিকা প্রচারিত হইয়া স্ত্রীশিক্ষার বিস্তার এবং নারীজাতির মহোপকার সাধিত হইতে পারে। আমরা গৃহপাঠ্য পুস্তকাবলী প্রচার আরম্ভ করিয়াছিলাম, কিন্তু প্রেসাভাবে সে চেষ্টা পরিত্যাগ করিতে হয়। ৪০ বৎসরের পুরাতন বামাবোধিনী হইতে অনেক উৎকৃষ্ট পুস্তক সঙ্কলিত হইয়া প্রচারিত হইতে পারে।

২।—বামাবোধিনীর স্থায়ী ফণ্ড বামাবোধিনীর গ্রাহক গ্রাহিকাগণ একটু মনোযোগ করিলেই হইতে পারে। বামাবোধিনীর প্রায় সহস্র গ্রাহক যদি এককালীন এক একটী টাকা দান করেন, সহস্র টাকায় ইহার একটী স্থায়ী ফণ্ড হইতে পারে। তদ্ভিন্ন বামাবোধিনীর পুরাতন গ্রাহক গ্রাহিকাগণের অনেকের নিকট যে টাকা পাওনা আছে, তাহা আদায় হইলে অনেক সহস্র টাকা হয়। তাঁহারা ঋণশোধ স্বরূপ না হউক, দান স্বরূপ বলিয়া যদি সেই টাকাগুলি ফেলিয়া

দেন, তাহা হইলে বামাবোধিনীর একটী ফণ্ড হইয়া ইহার স্থায়িত্বলাভের উপায় হয়। আমাদের গ্রাহক গ্রাহিকাগণ এজন্য স্বতঃ পরতঃ চেষ্টিত হইলে আমরা বড়ই উপকৃত হই। এ বৎসরের নূতন গ্রাহক গ্রাহিকার টাকা আমরা স্থায়ী ফণ্ডে জমা করিব মনে করিতেছি। বামাবোধিনীর প্রত্যেক গ্রাহক গ্রাহিকা যদি এক একটী নূতন গ্রাহক সংগ্রহ করিয়া দেন, তাঁহারা ইহার জীবন সম্বল করিয়া দিবেন।

৩।—বামাবোধিনীর পরিচালক-সমিতি গতবর্ষে নূতন করিয়া গঠিত হইয়াছে। তাহাতে ইহার লেখক লেখিকা এবং আরও কয়েকটী হিতসাধক বন্ধুর নাম আছে। আমরা ইহাকে আরও সুগঠিত করিতে চাই। বামাবোধিনীর অবলম্বিত নারী-সেবাব্রতে সহায়তা করিবার জন্য যাঁহারা অগ্রসর হইবেন, জাতিধর্ম্মনির্ব্বিশেষে আমরা তাঁহাদিগকেই সাদরে গ্রহণ করিব। আমরা বিশ্বাস করি, স্ত্রীশিক্ষা-হিতৈষী হিন্দু পুরুষ ও রমণীদিগের ন্যায় এদেশের মুসলমান ও খৃষ্টান নরনারীগণও বামাবোধিনীর উদ্দেশ্য সংসাধনে সক্ষম। তাঁহারাও আসিয়া আমাদের সহিত যোগদান করিয়া বামাবোধিনীকে উৎসাহিত ও উপকৃত করুন। অন্ততঃ ২।১টী রমণী বামাবোধিনীর সহায় হইয়া এ দেশের নারীগণের জন্য যদি জীবনোৎসর্গ করিতে অগ্রসর হন, তাহা হইলে তাঁহাদের জীবন সার্থক হয় এবং বামাবোধিনীরও প্রাণের গভীর আশা পূর্ণ হয়।

আমরা এখন আর অধিক কথা বলিতে চাহি না। বামাবোধিনীর সহৃদয় বন্ধুগণ ইহার স্থায়িত্ব ও উন্নতির জন্য কিরূপ উপদেশ ও সহায়তা দান করেন, তাহাই জানিবার প্রতীক্ষায় রহিলাম। তাঁহাদের সাহায্যে এই এক-চত্বারিংশ বর্ষে বামাবোধিনীর জীবনের একটী নূতন যুগের পত্তন হয়, তাহাই দেখিতে চাই এবং তাহারই জন্য ভগবৎ-চরণে প্রার্থনা করি।

সাময়িক প্রসঙ্গ।

পঞ্জিকার ফলাফল—১৩১০ সালের রাজা শুক্র, মন্ত্রী চন্দ্র। রাজা ও মন্ত্রীর গুণে এ বৎসর সুভিক্ষ ও প্রজাদিগের ধনধান্য বৃদ্ধির সম্ভাবনা। এবারকার জলাধিপ বৃহস্পতি, শস্যাধিপ রবি, মেঘাধিপ দ্রোণ, মোটের উপর এ বৎসরের ফল আশাপ্রদ।

রাজ-সংবাদ—সম্রাট এডওয়ার্ড ইউরোপের নানা দেশে ভ্রমণ করিতেছেন। পোর্টুগাল, স্পেন ও ফ্রান্স দেশে বহু সম্মান ও সমাদর লাভ করিয়াছেন এবং রোম নগরে ধর্ম্মাধ্যক্ষ পোপের সহিত সাক্ষাৎ করিয়া প্রভূত গৌরবান্বিত হইয়াছেন।

রাজপ্রতিনিধি লর্ড কুর্জ্জন উত্তর পশ্চিমের কতক দেশে ভ্রমণ করিয়া সপরিবারে ও সদলে সিমলায় উপনীত হইয়াছেন।

সূর্য্যের বয়ঃক্রম—কোন বৈজ্ঞানিক গণনা দ্বারা অবধারণ করিয়াছেন, সূর্য্যমণ্ডল ১০০,০০,০০,০০০ এক শত কোটি বৎসর হইল সৃষ্ট হইয়াছে।

আসামের শাসনকর্ত্তা— অনারেবল মহাত্মা বোল্টন প্রতিনিধি চিফ কমিসনার হইয়া আসামে গিয়াছেন। ইনি কলিকাতার মূকবধির-বিদ্যালয়ের উন্নতির যেরূপ সহায়তা করিয়াছেন, তাঁহাতে ইহাদ্বারা দেশের অনেক কল্যাণের আশা করা যায়।

বিশ্ববিদ্যালয়ের রেজিষ্ট্রার—বাবু কালীচরণ বন্দ্যোপাধ্যায় এম, এ, বি, এল, দুই বৎসরের জন্য কলিকাতা বিশ্ববিদ্যালয়ের রেজিষ্ট্রার নিযুক্ত হইয়াছেন। প্রতিনিধিরূপে যেরূপ যোগ্যতার সহিত কার্য্য নির্ব্বাহ করিয়াছেন, তাহাতে বিশ্ববিদ্যালয় তাঁহার দ্বারা লাভবান্ হইবেন সন্দেহ নাই।

প্রাদেশিক সমিতি—কংগ্রেসের বঙ্গ প্রাদেশিক সমিতি বহরমপুরে হইয়াছে। নাটোরের মহারাজা সভাপতির পদ গ্রহণ করিয়া একটী প্রশংসনীয় বক্তৃতা করিয়াছেন।

বিদেশীয় ছাত্রবৃত্তি—"সোসাইটি অব থিষ্টস্" নামক সভা নিম্নলিখিত তিনটী যুবককে ছাত্রবৃত্তি দিয়া জাপান ও আমেরিকায় পাঠাইতেছেন:—বাবু উপেন্দ্রনাথ কুণ্ড এম, এ, বাবু অজিতমোহন সেন ও বাবু সত্যসুন্দর দেব।

বাহু-যোদ্ধৃ রমণী—অল্পদিন হইল মাজ্রাজের দাক্ষিণাত্য ব্যায়াম সভার ক্রীড়াভূমিতে ঘুনচামান এবং ঘুনবাদসা নাম্নী দুই বেলুচি রমণীর মল্লযুদ্ধ হয়। অসংখ্য দর্শকের মধ্যে কতকগুলি ইউরোপীয় ভদ্র লোক ও রমণী ছিলেন। দশ মিনিট ক্রীড়ার পর ঘুনচামান তাঁহার প্রতিযোগিনীকে আঁটিয়া ধরিলেন। ১৫ মিনিট হটাহটির পর ঘুনচামান ঘুনবাদসাকে ফেলিয়া দিলেন এবং পরে তাহাকে পৃষ্ঠদেশে লইয়া চলিলেন। দর্শকগণ চারিদিকে জয়ধ্বনি করিতে লাগিল।

পেনেলের উন্নতি—যে জজ পেনেলকে গবর্ণমেণ্ট পদচ্যুত করেন, তিনি রেঙ্গুণে অল্পদিনে ব্যারিষ্টরী করিয়া মাসে ১৫০০, ২০০০ টাকা উপার্জ্জন করিতেছেন।

বিদ্যালয়ের পরীক্ষা—১৯০৪ সালের ৭ই মার্চ্চ এণ্ট্রেন্স এবং ২১ মার্চ্চ এফ এ, ও বি, এ এবং বি এস, সি পরীক্ষা গৃহীত হইবে। আগামী ১৮ই নবেম্বর এম, এ ও বি এল পরীক্ষা গৃহীত হইবে।

শোচনীয় মৃত্যু—(১) আমাদিগের পরমাত্মীয় বাবু আশুতোষ ঘোষ যিনি প্রায় ২০ বৎসর কাল বামাবোধিনীর সহকারী কার্য্যাধ্যক্ষ থাকিয়া ইহার কার্য্যের সহায়তা করিয়াছেন, গত ৩০এ এপ্রেল ১৩ দিনের জ্বরবিকারে ইহলোক পরিত্যাগ করিয়া আমাদিগকে মর্ম্মাহত করিয়াছেন। বিধবা

পত্নী, ৪টী শিশু পুত্র ও একটী কন্যা রাখিয়া গিয়াছেন। শান্তিদাতা তাঁহাকে শান্তি দান ও তাঁহার নিরাশ্রয় পরিজন-দিগকে রক্ষা করুন্।

(২) সুপ্রসিদ্ধ বি এল গুপ্ত মহাশয়ের পত্নী সৌদামিনী গুপ্তার আকস্মিক মৃত্যু সংবাদেও আমরা শোকব্যথিত হইয়াছি। বামাবোধিনীর বাল্যকালে তিনি (সৌদামিনী কান্তগিরী নামে) অনেক রচনাদি দ্বারা ইহাকে সুশোভিত ও উপকৃত করিয়াছিলেন। মঙ্গলবিধাতা তাঁহার আত্মার কল্যাণ ও তাঁহার শোকার্ত্ত স্বামী ও সন্তানগণের প্রাণে শান্তি বিধান করুন্।

বঙ্গদেশে স্ত্রীশিক্ষা।

স্ত্রীলোকদিগের শিক্ষা সম্বন্ধে এতদ্দেশীয় লোকদিগের মত তাঁহাদের কার্য্য দ্বারাই প্রকাশিত হইতেছে। বঙ্গদেশে বালিকারা যতদিন অবিবাহিত থাকে, ততদিন তাহা-দিগকে বিদ্যালয়ে প্রেরণ করা হয়। তাহাদের বিবাহ প্রায় দ্বাদশ বর্ষের মধ্যেই সম্পন্ন হইয়া থাকে। সুতরাং দ্বাদশ বর্ষ পর্য্যন্ত বালিকাদিগের শিক্ষার কাল। সপ্তম বর্ষ হইতে বিদ্যারম্ভ করিলে ছয় বৎসর কাল বালিকাদিগের শিক্ষার সময়। ছয় বৎসরে বিদ্যালয়ের চতুর্থ শ্রেণীতে পাঠ সমাপ্ত হয়। বর্ত্তমান নিয়মানুসারে ১৫ বর্ষ পূর্ণ না হইলে বালক বালিকারা প্রবেশিকা পরীক্ষা দিতে পারিবে না। শিক্ষা বিভাগের আরও একটী নিয়ম হইয়াছে যে তিন বৎসর বালক বালিকাদিগকে কেবল দেশীয় ভাষা শিক্ষা দেওয়া হইবে, তদনন্তর তাহারা ইংরেজী বিদ্যালয়ের পঞ্চম শ্রেণীতে পাঠারম্ভ করিবে। এ প্রণালী অনুসারেও দেশীয় ভাষা তিন বৎসর এবং ইংরেজী ভাষা পাঁচ বৎসর শিক্ষা করিলে ১৫ বৎসর বয়সে প্রবেশিকা পরীক্ষা দিবার উপযুক্ত সময় হইবে। সুতরাং ব্রাহ্ম ও খৃষ্টীয় সম্প্রদায়ভুক্ত ব্যক্তিদিগের কন্যা ভিন্ন অন্য কেহ চতুর্থ অথবা পঞ্চম শ্রেণী অপেক্ষা ঊর্দ্ধতন শ্রেণীর শিক্ষা লাভ করিতে পারিবে না। এখনও তাহাই হইয়া থাকে।

এখন জিজ্ঞাস্য এই যে, স্ত্রীলোকদিগের শিক্ষা কিরূপ হওয়া উচিত? ভাষা, প্রণালী, শিক্ষিতব্য বিষয় স্ত্রী পুরুষ সম্বন্ধে এক না বিভিন্ন হওয়া আবশ্যক? আমাদের দেশের শাসনকর্ত্তা ইংরাজ, রাজকীয় কর্ম্ম সকল ইংরাজীতে সম্পাদিত হয়, অতএব পুরুষদিগকে বাধ্য হইয়া ইংরাজী ভাষা শিক্ষা করিতে হয়; স্ত্রীলোকদিগের সম্বন্ধে সেরূপ বাধ্যবাধকতা আছে কি না? আপাততঃ বোধ হইতে পারে যে, ইংরাজী না শিখিলে সুশিক্ষা সম্ভবপর নহে। কিন্তু দিন দিন দেশীয় সাহিত্যের যেরূপ উন্নতি হইতেছে, তাহাতে সে

আশঙ্কা অমূলক বলিয়া বোধ হয়। ইতিহাস, ভূগোল, অঙ্কশাস্ত্র, পদার্থবিদ্যা স্বদেশীয় ভাষাতে শিক্ষা করিবার যথেষ্ট উপায় আছে। যাঁহারা উচ্চ গণিতাদি শিক্ষা করিতে অভিলাষ করেন, তাঁহাদের মনোরথ এ উপায়ে পূর্ণ হইবার এখনও সুযোগ হয় নাই। কিন্তু পুরুষেরাই বা কয় জন জ্যোতিষাদি উচ্চগণিত শাস্ত্র অধ্যয়ন করিয়াছেন? আমরা স্বীকার করি এ যুক্তি অতিশয় ক্ষীণ এবং সকল বিষয়ে খাটে না, কিন্তু পুরুষ ও স্ত্রীলোকদিগের সামাজিক অবস্থানুসারে শিক্ষা বিষয়ে এরূপ তারতম্য হওয়া অন্যায় নহে। এদেশের স্ত্রীলোকেরা সংস্কৃত না শিখিয়া লাটিন ভাষা শিখিলে উপহাসাস্পদ হইবেন, তাহাতে সংশয় নাই। ইংরাজ মহিলারা স্বদেশীয় ভাষাই শিক্ষা করেন, আমাদের স্ত্রীলোকেরা দেশীয় ভাষায় অবহেলা করিয়া কেন ইংরাজী শিখিবেন? বাল্যবিবাহ রহিত না হইলে বালিকাদিগের ইংরাজী ভাষা শিক্ষা করা সম্ভবপর নহে। সাধারণ হিন্দু পরিবারস্থ বালিকাদিগের অবস্থা এইরূপ। ব্রাহ্ম এবং খৃষ্টধর্ম্মাবলম্বিনী বালিকারা ইংরাজী উচ্চ শিক্ষা প্রাপ্ত হইতেছে, কিন্তু তাহাদের সংখ্যা অত্যন্ত অল্প। সমুদায় বঙ্গদেশে ১,০০,৭২২ জন বালিকা বিদ্যালয়ে শিক্ষা লাভ করিতেছে। সমস্ত বালিকা সংখ্যার সহিত তুলনা করিলে শতকরা একজন মাত্র বালিকা বিদ্যা শিক্ষা করিতেছে। এই সংখ্যাতে উচ্চ এবং নিম্ন শ্রেণী শিক্ষার্থিনী বালিকা গণনা করা হইয়াছে, কিন্তু কেবল উচ্চ শিক্ষাপ্রাপ্ত বালিকার সংখ্যা ৩৮৮৩, তন্মধ্যে হিন্দু ৪৩৯, মুসলমান ৬, দেশীয় খৃষ্টীয়ান ১৮৩, অন্যান্য ধর্ম্মাবলম্বী ৮৯। বিগতবর্ষে যে জনসংখ্যা গৃহীত হইয়াছিল, তদনুসারে বঙ্গদেশের স্ত্রীজাতির সংখ্যা ৩,৯২,১৫,২৪৪। এই সংখ্যানুসারে সহস্র স্ত্রীলোকের মধ্যে কেবল ৭ জন মাত্র লিখিতে পড়িতে পারে। এতদ্দৃষ্টে বঙ্গদেশের স্ত্রীশিক্ষার অবস্থা যে কি প্রকার শোচনীয়, তাহা অনুভব করা যাইতেছে। কলিকাতার অবস্থা দৃষ্টে সমুদায় বঙ্গদেশের স্ত্রীশিক্ষার উন্নতি বিচার করা কর্ত্তব্য নহে। কলিকাতায় ৭৭ সহস্র বালিকা আছে যাহাদের বিদ্যালয়ে যাইবার উপযুক্ত বয়ঃক্রম হইয়াছে, তন্মধ্যে ত্রয়োদশ সহস্রমাত্র লিখিতে পড়িতে পারে অর্থাৎ একশতের মধ্যে ১৭ জন। কিন্তু ইহাও বড় আশাজনক নহে। কলিকাতার আড়াইলক্ষ স্ত্রীলোক আছে, তন্মধ্যে ৩৩ সহস্র লিখিতে পড়িতে পারে অর্থাৎ শতকরা ১১ জন। ধর্ম্ম অনুসারে এইরূপ বিভাগ করা হইয়াছে—হিন্দু শতকরা ৯ জন, মুসলমান ৩ জন, খৃষ্টীয়ান ৭০ জন, ব্রাহ্ম ৫৩ জন, বৌদ্ধ ১৬ জন এবং য়িহুদী ৪৫ জন। সমুদায় বঙ্গদেশে বিগত সাত বৎসরে যত বালিকা বিদ্যালয়ে শিক্ষালাভ করিয়াছে, তাহার সংখ্যা নিম্নে প্রদত্ত হইতেছে;—

১৮৯৬—৯৭ সাল—১,০৫,৯১৯ বালিকা।
১৮৯৭—৯৮ „ ৯৮,০০০ „

১৮৯৮—১৮৯৯ সাল—৯৭,৯২৯ বালিকা।
১৮৯৯—১৯০০ „ ৯৯,৬০৭ „
১৯০০—১৯০১ „ ৯৬,৮৫৭ „
১৯০১—১৯০২ „ ১০০,৩২২ „

দৃষ্ট হইবে যে, প্রথম বৎসরে যত বালিকা শিক্ষালাভ করিয়াছিল, দ্বিতীয়বর্ষে তদপেক্ষা ৯১৯ জন হ্রাস হইয়াছে, তৃতীয় বর্ষে আরও ৭১ জন হ্রাস দেখা যায়; চতুর্থ বর্ষে কিছু বৃদ্ধি হইয়াছিল, কিন্তু পঞ্চম বর্ষে পুনর্ব্বার হ্রাস দেখা যায়। গত বর্ষে যদিও কিছু বৃদ্ধি হইয়াছিল, কিন্তু প্রথম বর্ষাপেক্ষা ৫,৫৯৭ বালিকা কম ছিল। দশ বৎসর পূর্ব্বে বালিকা-সংখ্যা ৮৮,৭৩১ ছিল, তাহার তুলনায় গত বর্ষে ১১৫৯১ জন অধিক বালিকা বিদ্যা শিক্ষা করিয়াছে। কিন্তু বিদ্যালয়ে যাইবার উপযুক্ত বালিকা-সংখ্যার সহিত তুলনা করিলে শতকরা ১ জন মাত্র বিদ্যা শিক্ষা করিতেছে। গবর্ণমেণ্ট স্ত্রীশিক্ষার এই দুরবস্থার কারণ আলোচনা করিয়া এই সিদ্ধান্ত করিয়াছেন, (১) বাঙ্গালীদিগের কুসংস্কার, (২) বালিকাদিগকে শিক্ষা দেওয়ার আবশ্যকতার জ্ঞানাভাব, (৩) বালিকা-বিবাহ, (৪) শিক্ষিতা শিক্ষয়িত্রীর অভাব, (৫) অন্তঃপুরস্থা অধিকবয়স্কা স্ত্রীলোকদিগের শিক্ষাদানের ব্যবস্থা না থাকা এবং (৬) অর্থাভাব। গবর্ণমেণ্ট শেষ তিনটী অভাব মোচনের জন্য সংকল্প করিয়াছেন। বর্ত্তমান বর্ষ হইতে বেথুন বিদ্যালয়ে এবং ব্রাহ্মবালিকা শিক্ষালয়ে শিক্ষয়িত্রী প্রস্তুত করিবার জন্য এক একটী শ্রেণী খুলিবার ব্যবস্থা করিয়াছেন, তথায়, কয়েকজন প্রাপ্তবয়স্কা বালিকা শিক্ষা লাভ করিতেছেন। উপযুক্ত বিজ্ঞাপন না দেওয়ায় এখনও শিক্ষার্থিনীর সংখ্যা বৃদ্ধি হয় নাই। আমরা বিদ্যালয়ের কর্ত্তৃপক্ষদিগকে অনুরোধ করি যে, বঙ্গদেশের দেশীয় প্রসিদ্ধ বাঙ্গলা ও ইংরাজী সংবাদপত্র সকলে এই বিষয়ের বিজ্ঞাপন দেওয়া হয়।

বিগত জনসংখ্যা বিবরণে স্ত্রীলোকদিগের ইংরাজী শিক্ষা সম্বন্ধে জাতি ও ধর্ম্ম সম্প্রদায় অনুসারে কয়েকটী জ্ঞাতব্য বিষয় প্রকাশিত হইয়াছে। কলিকাতার প্রায় ৩ সহস্র বৈদ্য, ২৪ সহস্র কায়স্থ, ২৭ সহস্র ব্রাহ্মণ বংশীয় স্ত্রীলোক আছেন, তন্মধ্যে বৈদ্যজাতীয়া স্ত্রীলোকেরা সর্ব্বাপেক্ষা অধিক শিক্ষিতা, কায়স্থজাতীয়া স্ত্রীলোক তাহাদের নিম্নে এবং ব্রাহ্মণকন্যারা তদপেক্ষা নিম্নতর স্থান অধিকার করেন। বৈদ্য ও কায়স্থ শতকরা দুই জনের অধিক ও ব্রাহ্মণ শতকরা ১॥ জন মাত্র ইংরাজী বিদ্যায় শিক্ষা লাভ করিয়াছেন। ইহার মধ্যে বাঙ্গালী খৃষ্টীয়ান শতকরা ৭১ জন, ব্রাহ্ম ৩৭ জন। দৃষ্ট হইবে যে, ব্রাহ্ম অপেক্ষা দেশীয় খৃষ্টীয়ান সম্প্রদায়ের স্ত্রীলোকেরা ইংরাজী শিক্ষাতে শ্রেষ্ঠ স্থান অধিকার করে। ব্রাহ্মদিগের মধ্যে শিক্ষার অবনতি দৃষ্টে জনসংখ্যা বিবরণে এইরূপ উক্ত হইয়াছে যে, প্রথমে সুশিক্ষিত লোকই ব্রাহ্মধর্ম্ম গ্রহণ করিত, কিন্তু বংশপরম্পরায় শিক্ষা বিষয়ে ঔদাস্য দৃষ্ট হইতেছে। আমরা এ স্থানে

কয়েকটী প্রধান ধর্ম্ম সম্প্রদায়ের বিগত ২০ বৎসরের স্ত্রীশিক্ষার অবস্থা প্রদর্শন করিয়া প্রস্তাবের উপসংহার করিব।

শতকরা কত স্ত্রী শিক্ষিতা।

	১৮৮১ সাল	১৮৯১ সাল	১৯০১
হিন্দু	৬ জন	৭ জন	৯ জন
মুসলমান	১ „	১ „	৩ „
খৃষ্টীয়ান	৬৭ „	৭০ „	৭০ „
ব্রাহ্ম	৬৪ „	৬৫ „	৫৩ „
বৌদ্ধ	১২ „	২৫ „	১৫ „

আমাদের পাঠিকাগণ দেখিতেছেন যে, হিন্দু সম্প্রদায়ের মধ্যে স্ত্রীশিক্ষার কি প্রকার দুরবস্থা, কিন্তু তাহাদের মধ্যে বোধ হয় অল্প অল্প উন্নতি আরম্ভ হইয়াছে। ব্রাহ্মদিগের স্ত্রীশিক্ষার অবনতির কারণ জন সংখ্যাতে যাহা প্রদর্শিত হইয়াছে, তাহা চিন্তার বিষয়। ১৯০১ খৃঃ কলিকাতার ব্রাহ্মের সংখ্যা ১৭৯৯ জন। ১৮৯১ খৃঃ অব্দে ব্রাহ্মসংখ্যা ৭৬৮ জন ছিল, সুতরাং বিগত দশ বৎসরের মধ্যে ব্রাহ্মসংখ্যা ১০৩১ জন বৃদ্ধি হইয়াছে। কিন্তু তাহাদের মধ্যে সেই অনুপাতে স্ত্রীশিক্ষার উন্নতি না হইয়া অবনতি ঘটিল কেন?

অনন্ত।

(১)

অসীমায়—তুমি অশেষ হে,
মহিমায় তুমি মহেশ হে,
বুদ্ধি মনের অতীত!
তবুও বাসনা করিয়ে সাধনা
ধরিব হৃদয়ে সতত।
চির-প্রদীপ্ত অবিচল
কোথায় আলোক সুবিমল?
ক্ষণিক প্রভায় ক্ষণদা সাজায়
জলদের তনু; তবু তায়
লভিবার তরে গরজন ভরে
অসীমে জলদ ছুটে ধায়।

(২)

অগম্য অপার অরূপ হে,
অজানা তোমার স্বরূপ হে,
অজ্ঞাত তুমি প্রভু গো।
কূল নাহি পাই, ভুলে তবু যাই,
লভিবারে চাই তবুও।
তুমি অনন্ত পারাবার,
দেশে কালে নাহি তীর তার।
উর্ম্মি খেলায় বালুকা বেলায়
সিক্ত করি সে দেহখানি;
বেলা কহে,"মোর এ ছিত সাগর,
অকূল সাগর নাহি জানি।"

শ্রীবিজয়চন্দ্র মজুমদার।

বীরপূজা।

বড় বেশী দিনের কথা নহে—কোনও একজন সুলেখক লিখিয়াছিলেন—"বাঙ্গালি কাঁদিতে শিখিয়াছে, মহৎ চরিত্র ও প্রতিভার আদর করিতে শিখিয়াছে।" সত্য, বাঙ্গালি কাঁদিতে শিখিয়াছে। সুরেন্দ্রবাবুর কারাবাসের সময় আমরা তাহা দেখিয়াছি। সে দৃশ্য এখনও সকলের প্রাণে জাগরূক রহিয়াছে। সত্য, বাঙ্গালি কতক পরিমাণে চরিত্র ও প্রতিভার মর্য্যাদা বুঝিয়াছে। মাননীয় আনন্দমোহন বসু ১৮৯৮ সালের ৫ই সেপ্টেম্বর তারিখে যখন ইংলণ্ড হইতে কলিকাতায় পদার্পণ করেন, সে দিন হাবড়া ষ্টেশনে যে জনতা, যে আনন্দ-কোলাহল ও জয়ধ্বনি উত্থিত হইয়াছিল, তাহাতে ইহার বিশেষ পরিচয় পাওয়া যায়। কিন্তু এ সকল সত্ত্বেও বাঙ্গালি প্রকৃত বীরপূজা শিখে নাই। শুধু মহৎ চরিত্র বা প্রতিভার জন্য অশ্রু বিসর্জ্জন করিলে অথবা মহৎ চরিত্র বা প্রতিভার সমক্ষে মস্তক অবনত করিলে বীরপূজা হয় না। বীরপূজাতে অশ্রুজল ও ভক্তির নৈবেদ্যের প্রয়োজন বটে, কিন্তু ইহা ব্যতীত বীরপূজার আরও উপকরণ আবশ্যক—বীরোচিত গুণলাভের জন্য ঐকান্তিক ইচ্ছা চাই।

রাজা রামমোহন রায় আমাদের দেশের একজন বিখ্যাত ধর্ম্মসংস্কারক, রাজনীতিজ্ঞ, সুপণ্ডিত লোক ছিলেন। তাঁহার জীবনের মূল্য ও মর্য্যাদা আমরা এখনও বুঝিতে পারি নাই। সুপরিচিত ব্যারিষ্টার শ্রীযুক্ত চন্দ্রশেখর সেনের "ভূ-প্রদক্ষিণ" পাঠ করিলেই তাহার বিশেষ পরিচয় পাওয়া যায়।—"ব্রিষ্টল, এখানে আসিবার প্রধান উদ্দেশ্য রাজা রামমোহন রায়ের সমাধি দর্শন। সুতরাং হোটেলে নামিয়াই আর্ণোডেল গোরস্থানে গমন করিলাম। * * * দ্বারদেশস্থ আপিসে একটী বৃদ্ধ বসিয়া আছেন, তাঁহার নিকট উপস্থিত হইলে তিনি বলিলেন, দ্বারকানাথ ঠাকুরকে দেখিয়াছিলেন। তৎপরে একখানি পুস্তক বাহির করিয়া তাহাতে লিখিতে বলায় এই কয়টী কথা লিখিলাম—"Visited the Raja's tomb, 8th August, 1890." * * * পুস্তকে দেখিলাম কেশবচন্দ্র প্রভৃতি কয়েকজন মাত্র ভারতসন্তানের হাতের লেখা আছে, অধিকাংশ বিলাতী বাঙ্গালীর নাম নাই দেখিয়া দুঃখ হইল। ইহা হইতেই বুঝা যায় আমরা এখনও জাতীয়তা লাভে অনুপযুক্ত, যেহেতু জাতীয় বীরপূজা শিখি নাই। রামমোহনকে পূজা করিতে না শিখিলে তদীয় গুণ পাইব কি প্রকারে?" সত্য বটে, আমরা তাঁহার স্মরণার্থ প্রতি বৎসর ২৭এ সেপ্টেম্বর তারিখে সভা আহ্বান করিয়া থাকি ও তাঁহার গুণাবলী বর্ণনা করিয়া থাকি, কিন্তু তাঁহাকে আদর্শরূপে গ্রহণ

করিয়া তাঁহার গুণাবলী স্বীয় চরিত্রে প্রতিফলিত করিতে কয়জন চেষ্টা করিয়াছি?

বিদ্যাসাগর মহাশয় সম্বন্ধেও সেইরূপ। তাঁহার অমর নামে অনেক সভা সমিতি প্রতিষ্ঠিত হইয়াছে, তাঁহার পবিত্র নামে অনেক বৃত্তি ও পদক বিতরিত হইয়াছে, কিন্তু সে চরিত্রকে আদর্শরূপে গ্রহণ করিতে কেহ পারেন নাই।

জাতীয় জীবন সংগঠন করিবার প্রধান উপকরণ বীরপূজা। সকল জাতির উন্নতির মূলে এই বীরপূজা বর্ত্তমান। যখন যে জাতি স্বদেশ ও বিদেশের বীরদিগের পূজা করিতে শিখিয়াছে—তাঁহাদিগকে আদর্শরূপে গ্রহণ করিতে শিখিয়াছে, তখনি সেই জাতি উন্নত হইয়াছে—জগতের একপ্রান্ত হইতে অপর প্রান্ত পর্য্যন্ত তাহাদিগের জয় ঘোষিত হইয়াছে। প্রাচীন রোমের উৎকর্ষ ও উন্নতি কেবল এই বীরপূজার বলেই সাধিত হইয়াছিল। বহু শতাব্দী পূর্ব্বে যখন হিন্দুগণ জ্ঞানধর্ম্মে জগতের সর্ব্বশ্রেষ্ঠ জাতিরূপে গণ্য ছিলেন, তখন বীরপূজা তাঁহাদের জাতীয় জীবনের প্রধান অঙ্গ ছিল; এবং আমাদিগের বিশ্বাস, এই বীরপূজাই পরে বিকৃতভাব ধারণ করিয়া অবতারবাদের সৃষ্টি করিয়াছে।

উন্নতির চরমোৎকর্ষ-সাধক, সভ্যতার উচ্চতম শিখরে আরূঢ় ইংরাজজাতি কেবল বীরপূজার বলেই আজ জগতের সকল জাতির শীর্ষস্থান অধিকার করিয়াছেন। ইংলণ্ডের ওয়েষ্টমিনিষ্টার আবি নামক সমাধিক্ষেত্রের বিষয় পর্য্যালোচনা করিলেই এ কথার সত্যতার প্রমাণ পাওয়া যাইবে। দেশের যত সাধু ও শিক্ষিত লোক, যত সুকবি ও বাগ্মীদিগকে এখানে রাজসম্মানে সমাহিত করা হইয়াছে। তাঁহাদিগের স্মৃতি রক্ষার জন্য কতপ্রকার আয়োজন করা হইয়াছে—তাঁহাদের চরিত্র লোকের জীবনে জাগরূক রাখিবার জন্য কত প্রকার চেষ্টা করা হইয়াছে! এই তীর্থক্ষেত্র সম্বন্ধে সুবিখ্যাত ওয়াসিংটন্ আরভিং লিখিয়াছেন—

"We feel that we are surrounded by the congregated bones of the great men of past times, who have filled history with their deeds, and the earth with their renown."

আমরা অনুভব করি অতীত কালের যে সকল মহাত্মার কীর্ত্তিতে ইতিহাস পূর্ণ এবং যাঁহাদিগের যশঃপ্রভায় পৃথিবী আলোকিত, তাঁহাদিগের অস্থিসমষ্টি দ্বারা আমরা পরিবেষ্টিত।

যে দেশের লোক এমন অনাবিল ভক্তির সহিত বীরপূজা করিতে শিখিয়াছে—সে দেশের ক্রমোন্নতি অনিবার্য্য।

হিন্দুশাস্ত্রে পরলোকগত পিতৃপুরুষদিগের তৃপ্তির নিমিত্ত তর্পণ বিধি আছে। যে সকল মহাত্মা যুগে যুগে অভ্যুদিত হইয়া ভারতের মঙ্গল সাধনের নিমিত্ত শরীরের শোণিত বিন্দু বিন্দু করিয়া ক্ষয় করিয়া গিয়াছেন, তাঁহাদের উপযুক্ত তর্পণ আমরা

কি প্রকারে করিব? ইঁহারাই ত আমাদের পিতৃপুরুষ। কি দিয়া আমরা ইঁহাদিগকে তৃপ্ত করিব? কি দিলে ইঁহাদের পরলোকবাসী আত্মা তৃপ্ত হইবে? জড়জগতের জড়বস্তুর দ্বারা তাঁহাদের তর্পণ হয় না, কুশ, তিলচূর্ণ, কদলীফলে তাঁহাদের স্বর্গগত আত্মা পরিতৃপ্ত হয় না,—তাঁহাদের তর্পণের জন্য চাই ভক্তি—চাই হৃদয়ের অশ্রু—চাই তাঁহাদের গুণাবলী লাভ করিবার জন্য ঐকান্তিকতা। তবে বীরপূজা হইবে। তবে আমরা আবার উঠিব—আবার আমাদের জাতীয় ভাব জাগরিত হইবে।*

শ্রীইন্দুপ্রকাশ বন্দ্যোপাধ্যায়।

ইলিয়াড।

(পূর্ব্ব-প্রকাশিতের পর)

প্রথম সর্গ।

হেনকালে উলিসিস আসি উত্তরিলা
ক্রাইসিস উপকূলে ভেটিতে যাজকে,
ক্রুসিসা সুন্দরী সহ লয়ে শত ধেনু—
বলি অর্ঘ্যভার; উত্তরি তথায় বীর
লয়ে ক্রুসিসারে আপোলো দেবের পূত
বেদীর সমীপে কহিলেন এইরূপে
সম্বোধি যাজকে "হে ক্রুসিস! নরপতি
আগামেম্নন্ প্রেরিলেন হেথা মোরে
অর্পিতে তোমারে ক্রুসিসা বালারে আর
দেব আপোলোর ক্রোধ-শান্তি হেতু এবে
তাঁহার সমীপে উৎসর্গিত শত ধেনু
বলি অর্ঘ্যভার।" এতেক কহিয়া বীর
করিলা প্রদান ক্রুসিসা বালারে পূজ্য
যাজকের করে। তবে আজ্ঞাক্রমে তাঁর
গ্রীকগণ ত্বরা আপোলো দেবের শুভ্র
পূত পীঠতলে সাজাইয়া রাখিলেক
আনি থরে থরে শতধেনু আর শত
নৈবেদ্য সম্ভার। উৎসর্গ সামগ্রী যত
নিবেদি এরূপে দেবের উদ্দেশে তারা
শুচি শুদ্ধচিতে ধৌত করি হস্ত পরে
করিলা ভোজন সুপবিত্র যব শস্য
মিলিয়া সকলে। ক্রাইসিস অতঃপর
আলিঙ্গি কন্যারে স্নেহে গ্রীকগণ পরে
প্রসন্ন করিতে ক্রুদ্ধ দেব আপোলেরে
কহিলেন এইরূপে কৃতাঞ্জলি-পুটে,
"হে দেব! যেমন পূর্ব্বে মোর প্রার্থনায়
ভীষণ মড়কে তুমি নাশিলে সক্রোধে
সসৈন্য সুমহাবলী গ্রীক চমূদলে,
তেমতি করুণা করি সিদ্ধ কর এবে
ভক্তের বাসনা, প্রভু! সুপ্রসন্ন চিতে
সে-কাল গ্রাস হতে রক্ষি অবহেলে
মৃত-অবশিষ্ট যত গ্রিসিয়ান-গণে।

লজ্জাবতী বসু।

---

* কার্লাইলের "Heroes and Hero-worship" পাঠে লিখিত।

বিসর্জ্জন।

"There are crushed hearts
that will not break,
And mine methinks is one
Or I shall not weep and wake
While thou art to slumber gone."

১। দেবি, তুমি গিয়াছ চলিয়া –
ভগ্ন হৃদয় শূন্য করিয়া—
নিভাইয়া দিয়া আশার বাতি
দিবস করিলে আঁধার রাতি,
জাগ্রত সকলি হইল স্বপন,
স্বপন ভাঙ্গিল পাইনু চেতন।

২। আহা আর কি গো পুনঃ
পাব ঘুমাইতে,
ঘুমঘোরে প্রেমডোরে
তোমারে বাঁধিতে,
আবেগে উৎসাহে হৃদয়ে টানিতে,
দগ্ধ হৃদয়ের জ্বালা জুড়াইতে
চলিতে চলিতে পথে এক সাথে
মিশি এক হব আত্মাতে আত্মাতে।

৩। হায় আশা! নিশার স্বপন
লুকাইল না উঠিতে উষার তপন,
না কহিতে একটিও কথা,
না জানাতে মরমের ব্যথা,
না ফিরাতে অনিমেষ আঁখি;
হৃদয়-পিঞ্জর ভাঙ্গি উড়িল সে পাখী।

৪। বড়ই নিঠুর সে যে মুক্ত বিমানের
পথে চলে যায় অগ্রে বাতাসের;
না কাঁদিল তাহার পরাণ,
প্রেমস্রোত বহিল উজান,
ফুরাল সকল সাধ আশা ভালবাসা,
নিভিল সুখের দীপ ঘেরিল নিরাশা।

ফা-হিয়ান।

বৌদ্ধধর্ম্ম-প্রবর্ত্তক গৌতমের জন্মস্থান ভারতবর্ষে; এই জন্য অতি প্রাচীন কালাবধি নানা স্থান হইতে বৌদ্ধযতিগণ তীর্থ পর্য্যটন ও ধর্ম্মগ্রন্থ সংগ্রহ মানসে ভারতে আগমন করিতেন। চীনদেশ হইতে যে সকল ধর্ম্মাত্মা ভারতবর্ষে আগমন করিয়াছিলেন, তাঁহাদিগের মধ্যে ফাহিয়ান ও হোয়েংসং এই দুইজনের নাম বিশেষ প্রসিদ্ধ।

ফাহিয়ানের সম্পূর্ণ নাম ফাহিয়ান কাক্যা। ইনি পিংয়ং জেলার অন্তর্গত বুয়াং নামক স্থানে কইয়ং বংশে জন্ম গ্রহণ করেন। ফাহিয়ানের তিনটী ভ্রাতা ছিল, তাহারা সকলেই বাল্যকালে কালগ্রাসে পতিত হওয়ায় তাঁহার পিতা তাঁহার জীবনে একপ্রকার হতাশ হইয়া তাঁহাকে সংসার হইতে অবসৃত করত এক বৌদ্ধ-ধর্ম্মমন্দিরে যতিধর্ম্ম শিক্ষার্থ প্রেরণ করেন।

কিছুদিন উক্ত মঠে অবস্থানের পর ফাহিয়ান গৃহে পিতামাতার নিকট প্রত্যাগত হন। গৃহে অবস্থানকালে তিনি এরূপ সাঙ্ঘাতিক পীড়ায় আক্রান্ত হন যে, তাঁহার আত্মীয়গণ তাঁহার জীবনের আশা পরিত্যাগ করেন। ফাহিয়ানের পিতা এই পীড়িত অবস্থাতেও পুত্রকে পুনরায় মঠে রাখিয়া আইসেন। ফাহিয়ান তথায় সম্পূর্ণ স্বাস্থ্য লাভ করিলেন। পুত্রশোকে কাতরা স্নেহময়ী ফাহিয়ান-জননী পুত্রদর্শনার্থ একান্ত অধীরা হইলেন। উপায়ান্তর না থাকায় তিনি মঠের অনতিদূরে একটী কুটীর নির্ম্মাণ করিয়া তাহাতে অবস্থানপূর্ব্বক পুত্রদর্শন-বাসনা পূর্ণ করিতে লাগিলেন।

দশম বর্ষ বয়স সময়ে ফাহিয়ান পিতৃহীন হন। তাঁহার মাতার ভরণপোষণের অন্ত কোনও উপায় নাই দেখিয়া তাঁহার পিতৃব্য তাঁহাকে যতিধর্ম্ম পরিত্যাগ করিয়া পুনরায় সংসার_আশ্রম গ্রহণ করিতে সনির্ব্বন্ধ অনুরোধ করেন; কিন্তু বালক ফাহিয়ান সংসারের মোহিনী মায়ায় মুগ্ধ না হইয়া পিতৃব্যকে বলিলেন, "সংসারের মলিনতা পরিত্যাগ করিবার জন্যই আমি এই পথ অবলম্বন করিয়াছি; আমার পিতা বিদ্যমান ছিলেন, এই কারণে আমি ইহা গ্রহণ করি নাই।" ফাহিয়ানের মুখে এই কথা শ্রবণ করিয়া তাঁহার পিতৃব্য তাঁহাকে মুক্তকণ্ঠে ধন্যবাদ ও অন্তরের সহিত আশীর্ব্বাদ করিয়া গৃহে প্রতিগমন করেন। তিনি আর কখনও তাঁহাকে সংসারাশ্রমে সংবদ্ধ করিতে চেষ্টা করেন নাই। পিতৃবিয়োগের অল্পকাল পরেই ফাহিয়ানের মাতা কালগ্রাসে পতিত হন। ফাহিয়ান স্বভাবসিদ্ধ ধর্ম্মভাবে ও বিশ্বাসের সহিত মাতার অন্ত্যেষ্টিক্রিয়া সম্পন্ন করিয়া পুনরায় মঠে আগমন করেন। তাঁহা কর্ত্তৃক যে মহৎ কার্য্য সংসাধিত হইবে, পাছে তাহাতে কোন বিঘ্ন উপস্থিত হয়, এই জন্যই যেন বিধাতা পূর্ব্ব হইতেই তাঁহাকে সংসারের বন্ধন হইতে মুক্ত করিয়া দিলেন।

একদা ফাহিয়ান ধর্ম্মভ্রাতৃগণের সহিত মাঠে ধান্য কর্ত্তন করিতেছিলেন, এমন সময় ক্ষুৎ-পিপাসাগ্রস্ত এক দস্যু ঐ কর্ত্তিত ধান্য লুণ্ঠন করিবার জন্য তথায় উপস্থিত হইল। দস্যুর হস্তে নিপীড়িত হইবার ভয়ে অন্যান্য যতিরা ধান্য ফেলিয়া পলায়ন করিল, কিন্তু ফাহিয়ান কিছুমাত্র ভীত বা বিচলিত না হইয়া দস্যুকে সম্বোধন করিয়া বলিলেন, "তুমি যদি এই ধান্য লুণ্ঠন করিতে ইচ্ছা কর, অনায়াসেই করিতে পার। গতজীবনে তুমি দরিদ্রকে ভিক্ষা প্রদান কর নাই, সেই জন্যই তোমাকে ইহজীবনে ক্ষুৎপিপাসায় উৎপীড়িত হইয়া অপরের শস্য লুণ্ঠন করিতে হইতেছে। পরজীবনে তোমাকে আরও না জানি কত কষ্টই ভোগ করিতে হইবে!" এই কথা বলিয়া ফাহিয়ান মঠে প্রত্যাগমন করিলেন। দস্যু ক্ষেত্রস্থ শস্যে হস্তার্পণ না করিয়া প্রস্থান করিল।

বয়োবৃদ্ধি সহকারে ফাহিয়ানের কর্ত্তব্য-

নিষ্ঠা ও ধর্ম্মপ্রবণতা বৃদ্ধি পাইতে লাগিল। বৌদ্ধধর্ম্মপুস্তকের অভাবে দিন দিন স্বদেশীয়দিগের অবনতি হইতেছে দেখিয়া তাঁহার হৃদয়ে দারুণ যন্ত্রণার উদয় হইল। স্বদেশীয়গণের ধর্ম্মজীবনলাভের পথ প্রশস্ত করিবার মানসে তিনি আপন জীবন উৎসর্গ করিতে কৃতসঙ্কল্প হইলেন। ভারতবর্ষে আগমনপূর্ব্বক বৌদ্ধ ধর্ম্মগ্রন্থ সংগ্রহ করিতে না পারিলে তাঁহার এই মহদিচ্ছা পূর্ণ হইবে না স্থির করিয়া তিনি শত সহস্র অসুবিধা সত্বেও ভারতবর্ষে আসিতে কৃতসঙ্কল্প হইলেন। খ্রীষ্টীয় ৩৯৯ অব্দে ফাহিয়ান কতিপয় ধর্ম্মভ্রাতাকে সমভিব্যাহারে লইয়া চীন রাজধানী টাওচিং হইতে পশ্চিমাভিমুখে ভারতবর্ষ উদ্দেশে যাত্রা করেন। কিছুদিন ক্রমাগত পর্য্যটনের পর তাঁহারা মধ্য আসিয়ার গোবী মরুভূমিতে উপনীত হইলেন। বালুসাগরে দিঙ্‌নির্ণয়ের অন্য কোন উপায় স্থির করিতে না পারিয়া তাঁহারা সূর্য্যের উপরাস্ত এবং মৃত পান্থগণের অস্থিরাশি লক্ষ্য করিয়া গমন করিতে লাগিলেন। এই মরুসাগরে তাঁহাদিগকে যে কিরূপ দুঃখ যন্ত্রণা ভোগ করিতে হইয়াছিল, তাহা বর্ণনাতীত। ফাহিয়ান নিজ চেষ্টার উপর নির্ভর করিয়া মরুসাগরের প্রাণনাশক বায়ুপ্রবাহ উপেক্ষা করতঃ স্বীয় গন্তব্য পথে অগ্রসর হইতে লাগিলেন। অক্লান্তভাবে কয়েকদিন ভ্রমণের পর তাঁহারা তুষারমণ্ডিত পামীর মালভূমিতে উপনীত হইলেন। এই স্থানে পর্ব্বতের চতুর্দ্দিগ্‌বিস্তৃত উচ্চ ও বিপদসঙ্কুল পার্ব্বতীয় সোপানাবলি বহু উচ্চ প্রাচীরের ন্যায় দণ্ডায়মান ছিল। ফাহিয়ান এই পথ প্রায় সাত শত বার পর্য্যটন করিয়াছিলেন। এই পর্য্যটনসময়ে তাঁহাকে বহুকষ্টে অর্দ্ধশতাধিক পার্ব্বতীয় প্রস্রবণ অতিক্রম করিতে হইয়াছিল।

ফাহিয়ান সঙ্গিগণসহ হিমালয়-প্রান্তে উপনীত হইলেন। এই সময়ে সহসা এক অতি শীতল বায়ুপ্রবাহ প্রবাহিত হওয়াতে তাঁহার সহচর হুইকিং দারুণ শীতে অতিমাত্র কম্পিতকলেবর ও গমনে একান্ত অশক্ত হইয়া তাঁহাকে সম্বোধনপূর্ব্বক বলিলেন, "আমি এই স্থানে কালগ্রাসে পতিত হইব, কিন্তু প্রিয় সহচর! তুমি ইহাতে কিছুমাত্র বিচলিত না হইয়া গন্তব্যপথে অগ্রসর হইও, আমার সহিত সমভাগ্য ভোগ করিও না।" এই কথা বলিয়া হুইকিং (Hwui-king) সেই স্থানে জীবনলীলা সংবরণ করিলেন। এই অত্যহিত ঘটনায় ফাহিয়ান ক্রন্দন না করিয়া থাকিতে পারিলেন না। তিনি মুমূর্ষু সহচরের স্কন্ধে ধীরে ধীরে করাঘাত করিয়া কহিলেন, "হায়! জীবনের উদ্দেশ্য সাধন করিবার পূর্ব্বেই তুমি ইহজগৎ হইতে বিচ্যুত হইলে। তোমার যেরূপ কর্ম্ম, তদনুরূপ ফল হইয়াছে। কর্ম্মের বিরুদ্ধে আমরা কি করিতে পারি?" নিজ উদ্দেশ্য সাধনে বদ্ধপরিকর হইয়া ফাহিয়ান পামীরের পরবর্ত্তী আরও ত্রিংশৎটী দেশ অতিক্রম করিয়া ভারতবর্ষের প্রান্ত-

সীমায় ক্রাভাস্তি নগরে উপনীত হইয়া একটী বৌদ্ধধর্ম্ম-মন্দিরের চূড়া অবলোকন করিলেন। এই মঠের সন্নিহিত হইতে প্রায় সন্ধ্যা হইয়া গেল। ফাহিয়ান গৃধ্র-কূট সন্দর্শনে একান্ত ইচ্ছুক হইয়া উক্ত মঠের সন্ন্যাসীকে আপন অভিপ্রায় জ্ঞাপন করেন। কিন্তু ঐ সন্ন্যাসী তাঁহাকে তিরস্কার করিয়া বলিলেন, "উহাতে উঠিবার পথ অতিশয় দুরূহ ও নানা বিপদ-সঙ্কুল। ঐ পথে নরমাংসলোলুপ কৃষ্ণকায় সিংহ সকল নিরন্তর বিচরণ করিতেছে। তুমি কিরূপে ঐ স্থানে গমন করিবে?" সন্ন্যাসীর এই কথায় ফাহিয়ান বলিলেন, "আমি শপথ করিয়াছি, চীনদেশ হইতে যতই দূরবর্ত্তী হউক না কেন আমি গৃধ্র-কূট সন্দর্শন করিব। চীন পরিত্যাগ-পূর্ব্বক বহু পর্য্যটনের পর এখানে উপস্থিত হইয়াছি। আমার জীবন চিরস্থায়ী নহে; ধর্ম্মসাধনে এই দেহ প্রাণ পরিত্যাগ করিতে আমি সর্ব্বদাই প্রস্তুত; অসুবিধা বা বিপদে আমার কিছুমাত্র ভয় নাই। আপনি অনুগ্রহ করুন; আমাকে ঐ ঈপ্সিত স্থানে গমনের বাধা প্রদান করিবেন না। আমি কিরূপে আমার বহুবৎসরের বিশ্বাস কলঙ্কিত করিব?" ফাহিয়ানের এই প্রকার দৃঢ়প্রতিজ্ঞা ও ধর্ম্মোন্মত্ততা দর্শন করিয়া ঐ সন্ন্যাসী পার্ব্বতীয় পথের রক্ষিস্বরূপ দুই জন শিষ্য সঙ্গে দিয়া তাঁহাকে গৃধ্রকূটে পাঠাইয়া দিলেন। গৃধ্রকূটে উপনীত হইতে সন্ধ্যা অতীত হইল। ফাহিয়ান তথায় রাত্রি অতিবাহিত করিতে মনঃস্থ করিলেন। কিন্তু তাঁহার পথপ্রদর্শক ও রক্ষক শিষ্যদ্বয় ভাবী বিপদের আশঙ্কায় তাঁহাকে একাকী তথায় ফেলিয়া পলায়ন করিল। ফাহিয়ান ইহাতে কিছুমাত্র চিন্তিত হইলেন না। প্রাচীন কালের এই ভগ্নাবশেষ অব-লোকনে তাঁহার হৃদয়ে এক অভূতপূর্ব্ব ভাবের সঞ্চার হইল। ইহাই যেন বুদ্ধের প্রতিমূর্ত্তি, এইরূপ জ্ঞান করিয়া তিনি সুগন্ধি ধূম প্রদানপূর্ব্বক ঐ পর্ব্বতকে পূজা করিতে লাগিলেন। রাত্রি ক্রমে গাঢ় হইয়া আসিল, তথাপি তাঁহার ধ্যানার্চ্চনা শেষ হইল না। তিনি বুদ্ধদেবকে হৃদয়ে ধারণ করিয়া তন্ময়ভাবে ধর্ম্মশাস্ত্র আবৃত্তি করিতেছেন, এমন সময় ভীষণদর্শন তিনটি কৃষ্ণবর্ণ সিংহ তাঁহার সম্মুখে আসিয়া উপ-স্থিত হইল। তাহারা জানু পাতিয়া উপবেশন করতঃ স্বক্কণি লেহন ও লাঙ্গুল আস্ফালন করিতে লাগিল। ফাহিয়ানের হৃদয়ে কিছুমাত্রও ভয়ের সঞ্চার হইল না। বস্তুতঃ যাঁহার হৃদয় ধর্ম্মের জ্যোতিতে জ্যোতিষ্মান্ হইয়াছে, যিনি অক্ষয় অমূল্য ধর্ম্মধনে হৃদয়ভাণ্ডার পূর্ণ করিয়া পার্থিব নশ্বর সুখসম্পদকে দূরে নিক্ষেপ করিতে সক্ষম হইয়াছেন, ধর্ম্মসাধন ভিন্ন যাঁহার জীবনের অন্য কোনও উদ্দেশ্য নাই, যিনি মৃত্যুকে দুঃখের হেতু জ্ঞান না করিয়া পূর্ব্ব-জন্মার্জ্জিত কর্ম্মফলের পরিণাম বলিয়া ধারণা করিতে সক্ষম হইয়াছেন, তিনি ইহাতে ভীত হইবেনই বা কেন? কথিত আছে, তিনি মন্ত্রোচ্চারণপূর্ব্বক সস্নেহ-

ভাবে সিংহত্রয়ের গাত্রে হস্তার্পণ করিয়া কহিলেন, "তোমরা যদি আমাকে গ্রাস করিতে আসিয়া থাক, তবে যতক্ষণ না আমার ধ্যানার্চ্চনা শেষ হয়, ততক্ষণ অপেক্ষা কর। আর যদি আমাকে ভীত করাই তোমাদের উদ্দেশ্য হয়, তবে ফিরিয়া যাও।" সিংহত্রয় মস্তক অবনত করিয়া রহিল। বলা বাহুল্য, তাহারা ফাহিয়ানের কিছুমাত্র অনিষ্ট করে নাই।

প্রভাত হইলে ফাহিয়ান প্রত্যাগমনে প্রবৃত্ত হইলেন। তিনি যতই অবতরণ করিতে লাগিলেন, পথ ততই অপ্রশস্ত, কণ্টক গুল্মে সমাচ্ছন্ন ও দুর্গম বলিয়া বোধ করিতে লাগিলেন। তিনি এই পথ দিয়াই উপরে উঠিয়াছিলেন, কিন্তু তৎকালে এরূপ অনুভব করেন নাই। কিছুদূর অবতরণ করিবার পর তিনি এক জন বৌদ্ধ যতির সন্দর্শন লাভ করেন। ঐ যতির বয়স প্রায় নবতি বর্ষ এবং পবিচ্ছদ যথাসম্ভব আড়ম্বরবিহীন ও অকিঞ্চিৎকর। তাঁহার মুখমণ্ডল তাঁহার হৃদয়ের গভীর ধর্ম্মভাবের নিদর্শন প্রকাশ করিতেছিল। ফাহিয়ানের মন তাঁহার উন্নত প্রকৃতি ও সৌম্যমূর্ত্তি দর্শনে যদিও আকৃষ্ট হইয়াছিল, কিন্তু তিনি কে তাহা জানিতে না পারাতে তাঁহার সহিত বাক্যালাপ করিলেন না। অল্পক্ষণ পরে অন্য একটী যুবক যতির দর্শন লাভ করিয়া তাঁহার নিকট জ্ঞাত হইলেন ঐ বৃদ্ধ যতি কশ্যপের প্রধান শিষ্য। ঐ মহাত্মার প্রতি অমনোযোগী হইয়াছিলেন বলিয়া তাঁহার দুঃখ কষ্টের আর সীমা থাকিল না। তিনি তৎক্ষণাৎ পর্ব্বতোপরি আরোহণ করিতে লাগিলেন, কিন্তু উক্ত ধর্ম্মাত্মা যে গুহায় প্রবেশ করিয়াছেন, তাহার দ্বার প্রকাণ্ড এক খণ্ড প্রস্তরে আবৃত রহিয়াছে দেখিয়া তিনি ক্রন্দন করিতে করিতে প্রত্যাবৃত্ত হইলেন।

(ক্রমশঃ)।

লোহানী বণিক্।

ইংরাজ রাজত্বের অব্যবহিত পূর্ব্বে ভারতবর্ষের সহিত মধ্য আসিয়ার বাণিজ্য কার্য্য কিরূপে নির্ব্বাহ হইত, তাহা শুনিলে আশ্চর্য্য হইতে হয়। স্বর্ণগর্ভা ভারতের ধন-ধান্য ও রত্ন-সম্ভারের কথা ভূমণ্ডলের সর্ব্বত্রই পরিজ্ঞাত ছিল। ইহার জনসংখ্যার আধিক্য, সভ্যতার আতিশয্য ও জাতি-মাহাত্ম্য দ্বারা আকৃষ্ট হইয়া পৃথিবীর সকল দেশেরই লোক এখানে পণ্য দ্রব্য আদান প্রদান করিতে ব্যস্ত থাকিত। বহুকাল হইতে মিসরের সহিত ভারতের বাণিজ্য-যোগ স্থাপিত ছিল, শেষে সমস্ত য়ুরোপ ভারতের বাণিজ্যের স্থান হইয়া উঠে। এই বাণিজ্যপ্রবাহ তুরুস্কের অন্তঃপাতী যুডিয়ার

প্রধান নগর জকসালমের মধ্য দিয়া প্রবাহিত হইত। বর্ত্তমান জাফ্‌ফা (প্রাচীন জপ্পা) বন্দরের সন্নিকটে একটী প্রকাণ্ড বন্দর ছিল। তথায় য়ুরোপজাত সামগ্রীসকল ফিনিসিয়ান্‌ ও ভূমধ্যসাগরের উপকূলস্থ অন্যান্য সমুদ্রগামী জাতিদিগের দ্বারা জলপথে সিন্ধুপোতে নীত হইয়া অরুসালেমে প্রেরিত হইত; তৎপরে কারাভান বা বণিক্‌-সম্প্রদায় কর্ত্তৃক পারস্য ও আফগানিস্থান দিয়া ভারতের অন্তঃপাতী মুলতান নগরে সমানীত হইত। মুলতান একটী মহানগর, বিশেষতঃ তখন ঐরাবতী ইহার নিম্নদেশে প্রবাহিত থাকাতে বাণিজ্যের পীঠস্থান হইয়াছিল। মুলতান হইতে সমস্ত পণ্য দ্রব্য ভারতের প্রধান প্রধান নগরে নীত হইত। অদ্যাপিও বেলুচিস্থান, আফগানিস্থান, পারস্য, তুর্কীস্থান ও মধ্য আসিয়ায় কাফিলা বণিক্‌দল মুলতানে আসিয়া প্রথম মিলিত হয়, তৎপরে অন্যান্য নগরে বিক্ষিপ্ত হইয়া পড়ে।

লোহানী বণিকেরা মধ্য আসিয়াবাসী। ইহাদিগকে পোভিন্দা অর্থাৎ দৌড়দার বলে। এক এক বণিক্‌-সম্প্রদায়ে দ্বাদশ সহস্রেরও অধিক লোক থাকিত। ইহারা সকলেই যোদ্ধা ও বীরপুরুষ। বাণিজ্য দ্রব্য সহিত যখন ইহারা সশস্ত্র দলবদ্ধ হইয়া যাত্রা করে, তখন বোধ হয় যেন তাহারা দিগ্বিজয় করিতে বহির্গত হইয়াছে। ইহাদের সহিত সচরাচর পণ্যবাহী পঞ্চাশ ষাটি সহস্র উষ্ট্র থাকে। সকল উষ্ট্রই বাণিজ্য-দ্রব্য-ভারে ভারাক্রান্ত। বণিক্‌গণ এই অসংখ্য উষ্ট্রদলকে মধ্য স্থানে রাখিয়া আপনারা সশস্ত্র সাবধান হইয়া তাহাদের অগ্র, পশ্চাৎ ও পার্শ্বদ্বয় রক্ষা করিয়া চলিতে থাকে। পণ্য দ্রব্যের স্থানীয় মূল্য দশলক্ষ টাকারও অধিক। কিন্তু কর, শুল্ক, উৎকোচ প্রভৃতিতে ইহার অনেক অংশ অপব্যয়িত হইত। বিশেষতঃ সীমাবর্ত্তী ও পার্ব্বতীয় দস্যুদল কর্ত্তৃকও সামান্য ক্ষতি সংসাধিত হইত না। এই সকল দস্যু দিবসে দলে দলে বণিক্‌দিগের অগ্রে অগ্রে গমন করিয়া কোন বিশেষ সঙ্কটস্থলে প্রচ্ছন্নভাবে অবস্থিতি করিত; পরে রজনীর অন্ধকারের মধ্যে সহসা চারিদিক্‌ হইতে আক্রমণ করিত। পথক্লান্ত বণিক্‌দল হয়তো ক্ষুৎপিপাসা নিবারণের উপায় অন্বেষণ করিতেছে; কেহ বা রন্ধন, কেহ বা ভোজন, কেহ বা বিশ্রাম, কেহ বা নিশ্চিন্তভাবে কথোপকথন করিতেছে। এরূপ অসতর্কতার সময় আক্রান্ত হইয়া বিশেষ ক্ষতিগ্রস্ত হইত। পণ্যদ্রব্যসহ শত শত উষ্ট্র লুণ্ঠিত হইত এবং তৎরক্ষার্থ যত্নবান্‌ হইয়া অনেক বণিক্‌ নিহত হইত। বাস্তবিক যখন তাহারা ভারতের সীমায় আগমন করিত, তখন তাহাদের পণ্য দ্রব্যের চতুর্থাংশও অবশিষ্ট থাকিত না। ইহা ব্যতীত প্রায় পাঁচ ছয় সহস্র উষ্ট্র ও শত শত লোক পথে প্রাণত্যাগ করিত। প্রত্যাগমনের সময়েও এইরূপ বিপদ! এত কষ্ট, ক্ষতি ও বিপদ সহ্য করিয়াও বণিক্‌-

দল প্রতিবর্ষে ভারতে বাণিজ্য করিতে আসিত। ইহারা প্রথমতঃ বোথারা হইতে যাত্রা করিয়া তথাকার শাসন-কর্ত্তাকে নিয়মিত শুল্ক দিয়া ক্রমে আমু-দরিয়া বা অক্সস্ নদের তীরে উপনীত হইত। দ্রব্যের শুল্ক ও পারের মাশুল দিয়া নদী পার হইয়া বক (বাহ্লীক) নগরে প্রবেশ করিতে হয়, কিন্তু অগ্রে পণ্য দ্রব্যের মাশুল না দিলে প্রবেশাধিকার নাই। তৎপরে খুলম, হুয়াব, কামার্ড, বামিয়ান্ ও কাবুলে পৃথক্ পৃথক্ শুল্ক দিয়া ভারতের সীমায় উপস্থিত হয়। আফগানিস্থানের আমীর তাহাদের উপর বিশেষ দৌরাত্ম্য করিতেন। তাঁহার নির্ণীত শুল্ক অত্যন্ত অধিক। যাতায়াতের উভয় সময়েই তাঁহার নির্দ্দিষ্ট করভারে বণিক-দল অত্যন্ত উৎপীড়িত হইত। যথা, আসিবার সময়—এক এক উষ্ট্র-ভার হিঙ্গের মূল্য ১৩০ টাকা, ইহার শুল্ক প্রতি উষ্ট্রভার ১৮ টাকা নিরূপিত। কিন্তু আকরোটের এ ভারের মূল্য ১৬ টাকা হইলেও প্রতিভারে ১৮ টাকা হারে শুল্ক দিতে হইত। পেস্তার ভারের মূল্য ১২০৲, শুল্ক ৩২৲ টাকা; বেদানার মূল্য ৩০৲, শুল্ক ১৮ টাকা। এইরূপ অন্যায় ও বলপূর্ব্বক শুল্ক গ্রহণে বণিক্‌দলের বিশেষ ক্ষতি হইত। আবার প্রত্যাগমনের সময়েও শুল্ক গ্রহণের উৎপীড়ন। ভারতবর্ষ হইতে আনীত প্রত্যেক উষ্ট্রভার বস্ত্রের মূল্য তিন সহস্র টাকা নির্দ্দিষ্ট হইলে ৭৪ টাকা মাশুল দিতে হইত। নীলের ভারের মূল্য ৪০০ টাকা, শুল্ক ৭২ টাকা; চায় মূল্য ৮০০, শুল্ক ৯৮ টাকা ইত্যাদি। এতদ্ব্যতীত পথে প্রত্যেক সরাই বা আড্ডাতে তত্রত্য ভিন্ন ভিন্ন রাজ্যের রাজ-পুরুষ ও অন্যান্য কর্ম্মচারীরা বলপূর্ব্বক বা ছলপূর্ব্বক শুল্ক ও উৎকোচ গ্রহণ করিয়া থাকে। ইহাদের সংখ্যাও অল্প নহে। যথা—অক্সস নদীর তীরবর্ত্তী তুর্কমান, মুঝরস্থরিফের উজবেগ দস্যু-দল, দাস্ত-সাফিদের তাতার, সয়ঘন ও বিস্তুটের হাজারা, কাবুল ও গজনির মধ্যবর্ত্তী উরদক্ জাতি; গজনি কুটাওয়াজের মধ্যবর্ত্তী হাটক জাতি, কুটাওয়াজের সুলেমান খাইল এবং সিন্ধুনদের উপত্যকাবাসী ওয়াজিরি জাতি স্বীয় স্বীয় অধিকার মধ্যে বণিক্‌দিগকে বিষম নিগ্রহ করিয়া থাকে। বণিক্‌গণ এই সকল দেশ ও পার্ব্বত্য পথ দিয়া বিশেষ সতর্ক হইয়া গমনাগমন করে। ইহারা কোথাও বা রাত্রিযোগে পলায়ন করিয়া অব্যাহতি লাভ করে। বোথারার মরুভূমি, পেরা-পামিসনের পাকদণ্ডি বা গিরিসঙ্কট, সিলজির অধিত্যকা, সুলেমানের পার্ব্বতীয় পথ এই প্রকারে অতিক্রম করিয়া পরি-শেষে সিন্ধুনদ পার হইয়া পঞ্জাবে উপস্থিত হয়। সুলেমান গিরি উল্লঙ্ঘনের সময় ইহারা বিশেষ সাবধান হইয়া থাকে। সর্ব্বদা সশস্ত্র ও সতর্ক হইয়া পণ্যবাহী উষ্ট্র-দিগকে যথাসাধ্য রক্ষা করিয়া থাকে। দিবারাত্রি এক মুহূর্ত্তের জন্য ইহারা বিশ্রাম করে না, তথাপি চতুর ওয়াজিরিদিগের

নিকট ইহাদিগের নিষ্কৃতি নাই। কখন কোন্ সময়ে হঠাৎ আক্রমণ করিয়া ২।৩টা বোঝাই উষ্ট্র গ্রহণপূর্ব্বক পর্ব্বতাঞ্চলে অদৃশ্য হইয়া যায় যে, কেহ সন্ধান করিতে পারে না। বণিক্‌দল কার্ত্তিক মাসে পর্ব্বতের পাদদেশে কোন নিরাপদ জনপদে সন্তান সন্ততি ও পরিবারবর্গকে রক্ষা করিয়া আপনারা বাণিজ্যদ্রব্য সমভিব্যাহারে ভারতের প্রধান প্রধান নগরে গমন করে। অধিকাংশ মুলতানে গমন করেএবং তথা হইতে অন্যান্য স্থানে বিক্ষিপ্ত হইয়া পড়ে। তাহারা কারমানের পশম অমৃতসর ও লুদিয়া নগরে লইয়া যায়। এই পশমে মোটা ও সুলভ সাল প্রস্তুত হয়। ইহাই লোকে সচরাচর ব্যবহার করে, সুতরাং কাশ্মীর শাল অপেক্ষা ইহার কাটতিও অধিক হয়। এতদ্ব্যতীত ইহারা রেশম, স্বর্ণ ও রূপার তার, শুষ্ক ফল, মেওয়া ও অশ্ব বিক্রয়ার্থ লইয়া আইসে এবং কার্পাস বস্ত্র, বিলাতী বস্ত্র, চিনের বাসন, ধাতুময় তৈজস, বনাত, বুটদার বস্ত্র, নীল, চা, মসলা, কার্পেট, লুঙ্গি, ছিট, স্বর্ণমুদ্রা, ঔষধ, মুক্তা, স্বর্ণজরি, স্বর্ণপত্র (সোণার পাত) ক্রয় করিয়া স্বদেশে লইয়া যায়। ১৭৮০ খৃষ্টাব্দে আমেদসার সাম্রাজ্যের বিধ্বস্ত কাল পর্য্যন্ত পোভিন্দা বণিক্-সম্প্রদায়ের এইরূপ দুরবস্থা ছিল, তৎপরে অনেক প্রতীকার হইয়াছে।*

হিমাচলের কাকু।

সজলা শস্যশ্যামলা বঙ্গদেশে বসন্ত সখা কোকিলের "কুহু কুহু" রবে কোন্ প্রাণ না বিমুগ্ধ হয়? কবির প্রধান সহায় কোকিল। তবুও কোকিল "পরভৃৎ" "শঠ শিরোমণি" প্রভৃতি অভিধানে প্রাণিতত্ত্ববিৎদিগের দ্বারা ব্যাখ্যাত। এই হিমাচলের শ্রেষ্ঠ গায়ক কোকিলজাতীয় "কাকুও" কোকিলের সুনাম হইতে বঞ্চিত নহে! তাই আজ কোনও সংবাদপত্রে তাহা পাঠ করিয়া তুলনায় সমালোচনা স্বরূপ ২।৪টী কথা বলিতে সাহসী হইতেছি। এই হিমাচল-শিরে ঘোর দুর্দ্দিনে বর্ষার অবিরল মুষলধারার মধ্যেও অমানিশার ঘোরান্ধকার ভেদ করিয়া "কাকু কাকু" মধুর গীতধ্বনি আমার ভগ্ন প্রাণে অনির্ব্বচনীয় ভাবের লহরীমালা উত্থিত করিয়া দিতেছে। শ্যামাঙ্গ "কাকু" এই হিমাচলবাসী। শত শত প্রাণীর তপ্ত নিশ্বাস শীতল করিবার জন্য সুখময়ী শান্তিদায়িনী নিদ্রার কোলে আপনার পরিশ্রান্ত ক্ষুদ্র দেহটী নিমগ্ন করিতেও ভুলিয়া গিয়াছে। "কাকু" হয়ত এ ঘোর তুহিনময় তমসাপূর্ণ রজনীতে স্বার্থপরতা ভুলিয়া—নিজ সুখ ভুলিয়া যদি একটী তাপিত প্রাণেরও

* Moral and Material Progress of India presented to Parliament—1872-73.

দুর্ব্বিষহ তাপ "কাকু" ধ্বনিতে অপসারিত করিতে সমর্থ হয়, তবে জীবন ধন্য বোধ করিবে। আজ এভাব তাহার সদানন্দ প্রাণে জাগিতেছে। কোনও বিখ্যাত প্রাণি-তত্ত্ববিৎ পণ্ডিত "কাকু" সম্প্রদায় মাত্রকেই "শঠ-শিরোমণি" বলিয়া বৈজ্ঞানিকভাবে প্রতিপন্ন করিবার প্রয়াস পাইয়াছেন। আমি বলি "কাকুকে" জ্ঞানগৌরব-প্রদীপ্ত-হৃদয় মানব যে বর্ণেই চিত্রিত করিতে প্রয়াস পাউন, ক্ষতি নাই। তাহার সদানন্দ "কাকু কাকু" গীত কখনও থামিবে না। তাই বলি "কাকু" তুমিই ধন্য! পঞ্চভূতের কৃপার উপর—বিজ্ঞানবিদ্‌গণের সুখ্যাতি অখ্যাতির উপর তোমার মোহন গীতি নির্ভর করে না। লোকে যত বলে বলুক, অবিশ্রান্ত "কাকু"ধ্বনি আকাশপথে দিবস রজনী একভাবে উত্থিত হইবেই হইবে।

এতকাল এ পবিত্র হিমাচল-শিখরে আতিথ্য গ্রহণ করিয়া কৃতার্থ বোধ করিতেছি। সদানন্দ "কাকু" রব যত কাল এইরূপ শীতবর্ষায়, সুখের বসন্তে অথবা দুর্দ্দিনের অমানিশায় অবিরল গীতধ্বনিতে দুঃখীর কর্ণে সুধাবর্ষণ করিবে, ততদিন প্রাণি-তত্ত্ববিদের কথায় কর্ণপাত না করিয়া বলিব "কাকু" তুমি ধন্য! কেন না "কাকু" ধার্ম্মিকতার কঞ্চুকে আপনাকে ঢাকিয়া লোককে ভুলাইতে চায় না। যখন "কাকু" ধ্বনি শুনিয়া কর্ণ মোহিত হয়, তখন ভাবি একবার আকৃতিটা দর্শন করিয়া চক্ষু তৃপ্ত করি; কিন্তু নিবিড়-কিসলয়-ভূষিত গগনস্পর্শী বিশাল "ওক" তরুর কোন্ অন্তরালে "কাকু" আপনাকে লুকাইয়া অনবরত গীতিসুধায় এ গিরি-শির পূর্ণ করিতেছে, এত কালেও তাহা খুঁজিয়া পাইলাম না। যাহা হউক অন্তরের কৃতজ্ঞতায় বলিতেছি—

সদানন্দ কাকু ধন্য ও ক্ষুদ্র পরাণ,
ভবের জঞ্জাল যাতে নাহি পায় স্থান।*

গীতাসার-ব্যাখ্যা।

(১৪)

"যা নিশা সর্ব্বভূতানাং তস্যাং জাগর্ত্তি সংযমী।
যস্যাং জাগ্রতি ভূতানি সা নিশা পশ্যতো মুনেঃ॥"

অজ্ঞানান্ধ জীবদিগের নিকট যাহা রাত্রি, যোগী ব্যক্তি তাহাতে জাগিয়া থাকেন, এবং যেখানে সকল জীব জাগিয়া থাকে, যোগী সেখানে রাত্রি দর্শন করেন।

বিষয়-রাজ্য ও অধ্যাত্ম-রাজ্য পরস্পর বিপরীত। একের দিবস, অন্যের রাত্রি; একের সুখ সম্পদ, অন্যের দুঃখ বিপদ;

---

* ইংরাজ কবির এই ভাবোচ্ছ্বাস কবিতে কেমন প্রকাশিত :—

"O Cuckoo! shall I call the Bird?
While I am lying on the grass
Thy two-fold shout I hear.
Even yet thou art to me,
No bird, but an invisible thing.

Then sing, ye birds, sing a joyous song!
We in thought will join your song,
Ye that pipe and ye that play,
Ye that through your hearts today
Feel the gladness of the May."

একের জীবন, অন্যের মৃত্যু। বিষয়ী লোকেরা অবিবেকী তমঃ-স্বভাব প্রবুক্ত অজ্ঞানান্ধ; এই জন্য ঈশ্বর, পরকাল,মুক্তি প্রভৃতি পরমার্থ-তত্ত্ব বিষয়ে তাহাদের জ্ঞান নাই এবং তাহারা এ সকলের চিন্তা করিতে গেলে অবিশ্বাস ও সংশয়ে আকুল হয়। নিশাচর পেচক, বাদুড় প্রভৃতি জন্তুদিগের প্রকৃতি কে না জানে? সূর্য্যের আলোক তাহাদের সহ্য হয় না; দিবা-লোকের মধ্যে তাহারা বড় কষ্ট পায়. এ জন্য চক্ষু মুদ্রিত করিয়া গুহা গহ্বরে বা নিভৃত স্থানে দিবস অতিবাহন করে, তাহাদিগের পক্ষে দিবসই রাত্রি। পরমার্থ-তত্ত্ববিদ মুনিগণ বিষয় অন্ধকারের পরপার আলোকময় সত্যরাজ্যে বাস করেন। তাঁহারা সর্ব্বদা সচেতন এবং দিব্য চক্ষে ব্রহ্মজ্যোতি দর্শন করিয়া পরম সুখে জীবন অতিবাহন করিয়া থাকেন। অজ্ঞান নিদ্রা হইতে তাঁহারা প্রবুদ্ধ হইয়াছেন, মোহ মায়ার জাল ছিন্ন করিয়াছেন, মৃত্যুর অন্ধকার অতিক্রম করিয়াছেন, সুতরাং আর তাহাতে আবৃত হন না। তাঁহারা সংযমী, ইন্দ্রিয় রাজ্যের রূপ রস গন্ধ শব্দ স্পর্শ এসকল হইতে চিত্তকে সংযত করিয়া আত্মযোগে সর্ব্বদা যুক্ত। তাঁহারা অধ্যাত্ম-রাজ্যের দিব্য শক্তি লাভ করিয়া পরমাত্মার দর্শন, শ্রবণ, মনন ও নিদিধ্যাসনে নিরত। তাঁহাদের আধ্যাত্মিক ইন্দ্রিয় সকল কেমন বিকসিত! সে কি নির্ম্মল চক্ষু, যাহাতে অপরূপ ব্রহ্মরূপ দর্শন হয়! সে কি সুন্দর কর্ণ, যাহাতে সুমিষ্ট ব্রহ্মবাণী শ্রুত হয়! সে কি স্বর্গীয় নাসিকা, যাহা পুণ্যের সুঘ্রাণে পুলকিত হয়! সে কি দিব্য রসনা, যাহা দ্বারা ব্রহ্ম-প্রেম-সুধার আস্বাদন হয়, রসস্বরূপ তৃপ্তিহেতু বলিয়া ব্রহ্মসুধাসাগরে আত্মা নিমগ্ন হয়! সে কি অলৌকিক স্পর্শশক্তি, যাহাতে সাক্ষাৎ-ব্রহ্ম-স্পর্শসুখ লাভ হইয়া "মিশে নদী জলধিতে হয় একাকার" পরমাত্মার গাঢ় আলিঙ্গনে আত্মা আত্মহারা হইয়া তন্ময় হইয়া যায়! অধ্যাত্ম-রাজ্যের এই সকল মহাসত্য বিষয়ান্ধ লোকদিগের নিকট দুর্ব্বোধ্য প্রহেলিকা অথবা কল্পনার কথা মাত্র। কিন্তু যোগীদিগের ইহাই জীবনের সার, ইহাই লক্ষ্য ও উদ্দেশ্য এবং আশা ও সাধনার বিষয়। এই জন্য গীতার এই অদ্ভুত উক্তি—সর্ব্বভূত যেখানে গাঢ় অন্ধকারাচ্ছন্ন নিশা দর্শন করে, সংযমী সেখানে দিব্য চক্ষু লাভ করিয়া আলোকের দেশে জাগিয়া থাকেন।

সাধারণ জীব জন্তু সকল যেখানে জাগিয়া থাকে, মুনি সেখানে রাত্রি দর্শন করেন, ইহাও উপরি-উক্ত সত্যের আর এক দিক্। সাধারণ জীবসকল কোথায় জাগিয়া থাকে? নিশাচর পেচক চামচিকা বাদুড় প্রভৃতির রাত্রিতেই আনন্দ। তাহাদের দিবান্ধ চক্ষু অন্ধকারে ফুটিয়া উঠে। তাহারা তখন উল্লাসে জীবন ধারণ করে, উল্লাসে স্ব স্ব কার্য্য সাধনে প্রবৃত্ত হয় এবং উল্লাসে ভোগ্য বস্তু লাভ করিয়া তাহা উপভোগ করে। বিষয়নিষ্ঠ ব্যক্তিদিগের অবস্থা ঠিক্ সেইরূপ। তাহারা ব্রহ্মজ্যোতির

আলোকময় দিবাতে অন্ধ হইয়া থাকে, কিন্তু অজ্ঞান অন্ধকারপূর্ণ বিষয় নিশাতে জাগিয়া উঠে, স্ফূর্ত্তি সহকারে আপনাপন কার্য্যে প্রবৃত্ত হয় এবং বিষয়-মোহে হত-চেতন হইয়া কতই সুখ অনুভব করে! শকুনি যেমন উচ্চ আকাশে থাকিয়া ভূমিস্থ আমিষ দেখিতে পায় এবং ছুটিয়া আসিয়া তদ্ভক্ষণে প্রবৃত্ত হয়; বিষয়ীর স্বার্থদৃষ্টি সেইরূপ প্রখর এবং সংসারের ধন মান সুখ সম্পদ পদগৌরব যেথানে,সেই খানেই তাহার প্রবৃত্তি ধাবিত হয়। স্বার্থলাভের জন্য—বিষয়ভোগের জন্য বিষয়ী কোন্ অন্যায় কার্য্য ও অধর্ম্ম না করে? 'যেন তেন প্রকারেণ' আপনার স্বার্থসাধনে সে মহা ব্যস্ত এবং তাহার জীবন এই স্বার্থসাধন লইয়া। একবার ভাবে না যে এ জীবন এবং ইহার সকল ঐশ্বর্য্য গৌরব ক্ষণস্থায়ী—মৃত্যুর স্পর্শমাত্র সকলি বিনাশ পাইবে। আত্মজ্ঞ মুনি বিষয়-রাজ্যের ব্যস্ততা ও কোলাহলের মধ্যে প্রসুপ্ত হইয়া থাকেন, কেননা ইহা তাঁহার নিকট রাত্রি। তিনি এখানে অন্ধ, তাঁহার স্বার্থসাধনে দৃষ্টি নাই। তিনি বধির, সংসারের অসার কথা শুনিতে পান না। তিনি জীয়ন্তে মরা, সংসারের সুখ দুঃখ তাঁহার অনুভব হয় না। যেখানে বিষয়-ব্যস্ততা নাই, মোহ-কোলাহল নাই, সংসারের চাক্‌চিক্য দেখিতে হয় না, সেইখানে বিরলে বসিয়া একাকী আপনার প্রাণারাম আনন্দধাম পরব্রহ্মকে লইয়া তিনি তাঁহাতেই ক্রীড়া করেন, তাঁহাতেই রমণ করেন এবং তাঁহাকে লইয়াই জীবনের সকল কার্য্য সমাধা করেন।

"আত্মক্রীড় আত্মরতিঃ ক্রিয়াবান্ এষো
ব্রহ্মবিদাং বরিষ্ঠঃ॥"

ব্রহ্মজ্ঞ মহর্ষি গাহিয়াছেন :—"যোগী জাগে, ভোগী রোগী কোথায় জাগে; ব্রহ্মজ্ঞান,ব্রহ্মধ্যান, ব্রহ্মানন্দরস পান করে যেই সেই জাগে।" হে জীব, বিষয় নিদ্রা ত্যাগ কর এবং ঈশ্বর মননে জাগ্রত ও সচেতন হও, যথার্থ দিবারাত্রি কি তাহা বুঝিতে পারিবে এবং দিব্যালোকে আপনার সার কার্য্য ও পরম সুখসাধনে সমর্থ হইবে।

নবীন-ভারতী।

(২)

সাধনের তিন অবস্থা—প্রবর্ত্ত, সাধন ও সিদ্ধ। ইহাদের এক একটীর আবার তিন তিন অবস্থা—(১) প্রবর্ত্ত প্রবর্ত্ত, প্রবর্ত্ত সাধন, প্রবর্ত্ত সিদ্ধ। (২) সাধন প্রবর্ত্ত, সাধন সাধন, সাধন সিদ্ধ। (৩) সিদ্ধ প্রবর্ত্ত, সিদ্ধ সাধন, সিদ্ধ সিদ্ধ।

এক চির-অন্ধকার-দেশবাসী লোক কোন ক্রমে ভাগ্যযোগে যে দেশে সূর্য্যো-দয় হয়, সেই দেশে এক ব্যক্তির বাটীতে

আসিয়া পড়িল। রাত্রিকালে অন্ধকারে নিদ্রিত আছে, কিছুই বুঝে নাই। কিন্তু উষাকালে বিহঙ্গরবে যখন তাহার নিদ্রা-ভঙ্গ হইল, দেখে—গৃহের ফাঁক দিয়া সাদা সাদা কি দেখা যাইতেছে। তখন রাত্রির নিবিড় অন্ধকার গিয়া চারিদিক্ ধূসরবর্ণ হইয়াছে। সে দ্বার খুলিয়া বলে বা এ কি! এমনত কখন দেখি নাই, ঐ যে চারিদিকে এত বস্তু লুকাইয়াছিল, ছায়া ছায়া দেখিতেছি। গৃহবাসী বলিলেন আর একটু অপেক্ষা কর—আরও কত দেখিবে। সে ব্যক্তি কিছুক্ষণ পরে দেখিল সে ধূসরবর্ণ চলিয়া গিয়া চারি দিকে শুভ্র আলোক প্রকাশিত এবং যাহা ছায়া বোধ হইতেছিল, তাহা সুন্দর পর্ব্বত, বৃক্ষ, অট্টালিকা ইত্যাদি। তখন সে বলিল "কি চমৎকার! কি চমৎকার!" গৃহস্থ বলিল আরও অপেক্ষা কর আরও কত দেখিবে। বলিতে বলিতে রক্তোজ্জ্বল অরুণ কাঞ্চনথালার ন্যায় উদয় হইল, তাহার কিরণ-ছটা সহস্র সহস্র চারি দিকে বিকীর্ণ হইয়া পর্ব্বত, বৃক্ষ, গৃহচূড়া সকল স্বর্ণমণ্ডিত করিল। আগন্তুক বলিল "এ কি অদ্ভুত, কি অপূর্ব্ব!" গৃহস্থ বলিল এখনও শেষ হয় নাই, আরও দেখিবার আছে। বিদেশী দেখিল সেই তরুণ অরুণ ক্রমে আরও জ্যোতিষ্মান্ হইয়া পূর্ব্বদিক্ হইতে আকাশ পথে উঠিতে লাগিল এবং ক্রমে সকল বস্তু আরও পরিষ্কার আরও উজ্জ্বল; যাহা শীতল ছিল, তাহা তপ্ত হইয়া উঠিতেছে। দেখিতে দেখিতে সূর্য্য-মণ্ডল মস্তকের উপর আসিল, শত সহস্র অগ্নিকুণ্ড জ্বলিয়া উঠিল। প্রচণ্ড মার্ত্তণ্ড-তাপে জগৎ দগ্ধ হইতে লাগিল। ছায়া সকল সরিয়া সরিয়া পার নীচে গিয়া লুকাইল। বিদেশী দেখিয়া নিস্তব্ধ ও অবাক্! তখন গৃহস্থ বলিল আরও আছে। এই দেখ এই সূর্য্যকে হাতের মুঠার ভিতর রাখিতেছি, যখনি ইচ্ছা হাত খুলিয়া ইহাকে দেখিব ও ইহার আলোকে সব দেখিব।

সংসারান্ধকার-দেশবাসী সত্যের অনুসন্ধানে আসিয়া এরূপ আশ্চর্য্য আলোকের রাজ্য দর্শন করিয়া যত সাধন-পথে অগ্রসর হয়, তত তাহার দৃষ্টি উজ্জ্বল হয়। সিদ্ধ ব্যক্তি আলোকের দেশের লোক এবং আলোক তাহার মুঠার মধ্যে।

---

(৩)

আত্মার সংসার হইতে পরমাত্মার সহিত স্থিতি।

এক ঐশ্বর্য্যশালী ব্যক্তি এক কুরূপা নির্গুণা দরিদ্রের কন্যাকে বিবাহ করিলেন। অষ্টমবর্ষীয়া কন্যা পতিকে চেনে না, পতির মর্য্যাদা কিছু বুঝে না, পাড়ার খেলুড়ীদের সঙ্গে খেলা করিয়া বেড়ায় আর বাপের বাড়ী খায় দায়। স্বামী ছদ্মবেশী আপনাকে সামান্য লোকের মত দেখান—ধনী বলিয়া চিনিতে দেন না। তিনি মধ্যে মধ্যে শ্বশুরবাড়ীতে আসেন। স্ত্রী দেখিয়া পলাইয়া যায় এবং খেলুড়ীদের

সঙ্গে মিশিতে চায়। ক্রমে ক্রমে স্ত্রীর বয়স বাড়িতে লাগিল, স্বামীর পুনঃপুনঃ যাতায়াতে চেনা পরিচয় হইতে লাগিল। তখনও তাহার লজ্জা। পরিজনদের অনুরোধে কখনও স্বামীর আহারের স্থান করে, শয্যা প্রস্তুত করে, হাতে একটা পান দিয়া চলিয়া যায়। স্বামী আরও ঘন ঘন আসেন, ক্রমে তাহার সহিত একত্র শয়ন এবং আলাপ হয়। এই অবস্থায় খেলুড়ীদের সঙ্গ ক্রমে মেশামিশি কমিল এবং সে স্বামীর ভাবনা ভাবিতে লাগিল ও তাহার আগমনের দিন প্রতীক্ষা করিতে লাগিল। তখন স্বামী আসিলে তাঁহাকে ছাড়িয়া থাকিতে তাহার কষ্ট হয়। খেলুড়ীরা বার বার ডাকিলে সে অনিচ্ছাপূর্ব্বক এক আধ বার যায় আবার ফিরিয়া আইসে, বলে ভারি কাজ আছে ভাই, ক্ষমা কর, আজ তোমাদের সঙ্গে খেলিতে পারিব না। অবশেষে স্বামীর সহিত আলাপ ও আনন্দে এত সুখ পায়, খেলা দেলা তার ভাল লাগে না, সে স্বামীকে লইয়া ঘরে দ্বার আঁটিয়া থাকে; খেলুড়ীরা ডাকিয়া ডাকিয়া তার সাড়া পায় না, নিরাশ হইয়া ফিরিয়া যায়।

স্বামী যখন দেখিলেন তাঁহার প্রতি স্ত্রীর মন বসিয়াছে, তখন আপনার অবস্থাদির কথা সব খুলিয়া বলিলেন। তখন স্ত্রী বুঝিল ইনিই আমার আপনার, বাপের বাড়ী পরের বাড়ীতে আছি। সে স্বামীকে জিদ্ করিয়া ধরিল, এখান হইতে তোমার বাড়ীতে আমাকে লইয়া যাও। স্বামী তাহাই চান, তখন আনন্দের সহিত স্ত্রীকে লইয়া বাটী গমন করিলেন। স্ত্রী সেখানে গিয়া দেখেন স্বামীর অতুল ঐশ্বর্য্য সম্পদ— কত অশ্ব হস্তী রথ, কত দাস দাসী, কত অট্টালিকা উদ্যান সরোবর—আর তিনি সেই সকলের অধিকারিণী। গরিবের মেয়ে কুরূপা গুণহীনা, তখন স্বামীর মর্য্যাদা বুঝিতে লাগিল, তাঁহার হইয়া তাঁহার গৃহে রহিল এবং প্রাণ দিয়া তাঁহার চরণসেবা করিতে লাগিল।

---

(৪)

মিথ্যাবাদী ও সত্যবাদীর উপাখ্যান।

এক সত্যবাদী ও মিথ্যাবাদী দুই বন্ধু ছিলেন। সত্যবাদী ধনী লোক এবং অতি উদার ও বদান্যস্বভাব। মিথ্যাবাদী শৈশবে নিরাশ্রয় ও নিঃসম্বল ছিল; বন্ধু তাহাকে আপনার বাটীতে আনিয়া অন্ন বস্ত্র দিয়া প্রতিপালন করেন, শিক্ষা দেন, যথাসময়ে বিবাহ দেন। তারপর তাকে আরও সুখে স্বচ্ছন্দে রাখিবার জন্য ঘর বাড়ী জমি দিয়া তাহাকে ক্ষুদ্র একটী স্বাধীন ভূস্বামী করিয়া দেন। মিথ্যাবাদী সকলই জানে এবং প্রতিপালকের সহিত সাক্ষাৎ হইলে মুখে খুব কৃতজ্ঞতা প্রকাশ করে। একদিন সে বলিল "প্রিয় বন্ধু! আপনা হইতে আমার সবই, কিন্তু আপনার কিছুই করিতে পারি না। আজি মনে করিয়াছি, এই সুন্দর উদ্যানটী আপনাকে দিব, আপনি ইহা লউন্। সত্যবাদী কিছু

না বলিয়া মনে মনে হাসিলেন। পরদিন দেখা হইলেই মিথ্যাবাদী বলিল "না, ও উদ্যানটী আপনাকে দিতে না পারিয়া দুঃখিত হইলাম, উহা আমার কন্যার প্রিয় ভ্রমণ-স্থান।" কিছুদিন যায় আবার সত্যবাদীর সহিত মিথ্যাবাদীর সাক্ষাৎ হইলে লজ্জা প্রকাশ করিয়া বলিল "আপনাকে উদ্যান দিতে পারি নাই। এই সুন্দর পুষ্করিণীতে অনেক মাছ আছে, এইটী আপনি লউন্।" সত্যবাদী মনে মনে হাসিলেন মাত্র। পরে দেখিলেন, তাহার এক ভৃত্য আসিয়া সত্যবাদীকে বলিল "পুষ্করিণীটী দান করাতে বাটীতে বড় গোলযোগ বাধিয়াছে। আমার প্রভুর স্ত্রী বলেন এ পুষ্করিণীতে অনেক মৎস্য আছে, ইহা ছাড়িতে পারিব না।" সত্যবাদী বলিলেন "তা বেশ, তাঁহারই পুষ্করিণী তাঁহারই থাকুক।" মিথ্যাবাদী এবার নিষ্কৃতি পাইল। কয়েক বৎসর পরে আবার সত্যবাদীর সহিত তাহার সাক্ষাৎ হইলে আপনার ত্রুটি স্বীকার করিয়া বলিল, "আসুন্, আমার বাটীতে পদার্পণ করিতে হইবে।" সত্যবাদী সঙ্গে সঙ্গে চলিলেন। একটী সুসজ্জিত গৃহে বসিয়া উভয়ে কথাবার্ত্তা কহিয়া পরম সন্তোষ লাভ করিলেন। পরে মিথ্যাবাদী বলিল "এই ঘরটী আপনার জন্যই রাখিয়াছি। আপনি আমাকে দয়া করিয়া সব দিয়াছেন, এইটী লইয়া যথেচ্ছ ব্যবহার করুন্।" সত্যবাদী বিদায় লইলে মিথ্যাবাদীর পুত্র আসিয়া বলিল "বাবা, এ ঘরটী না আর কাহাকে দিয়াছ ? আমি যে এখানে বৈঠকখানা করিব, কখনই ছাড়িব না।" মিথ্যাবাদী অগত্যা এক পত্র দ্বারা সত্যবাদীকে এই গোলযোগের কথা জানাইয়া দানটী প্রত্যাহার করিলেন। অনেক দিন চলিয়া গেলে মিথ্যাবাদী একদিন আপনার অধিকার ছাড়াইয়া বেড়াইতে বেড়াইতে একাকী এক নির্জ্জন প্রান্তরে আসিয়া পড়িয়াছেন, সেখানে সত্যবাদীর সহিত দেখা হইল। তখন তিনি মন খুলিয়া আপনার জীবনের সব কথা তাঁহাকে বলিলেন এবং তাঁহার ধন জন ঐশ্বর্য্য সকলি সত্যবাদীর দেওয়া বলিয়া স্বীকার করিলেন। আর দুঃখ করিতে লাগিলেন এত পাইয়া কিছুই তাঁহাকে দিতে পারেন নাই। তখন সরল অন্তরে কাঁদিতে কাঁদিতে বলিলেন "তোমার দেওয়া সবই তুমি লও, লইবে বল, না হইলে ছাড়িব না।" সত্যবাদী তাহাকে নাছোড়বান্দা দেখিয়া বলিলেন "তথাস্তু"। পরে সত্যবাদী এক একটী করিয়া সম্পত্তি অধিকার করিতে প্রবৃত্ত হইলেন। মিথ্যাবাদীর বাটীতে মহা গোলযোগ বাধিল। মিথ্যাবাদী স্ত্রী পুত্র কন্যা আত্মীয় বন্ধু কুটুম্ব এমন কি দাসদাসীর নিকটে লাঞ্ছিত ও তিরস্কৃত হইতে লাগিল। সকলে বলেন তুমি কতবার দিয়া আবার ত ফিরাইয়া লইয়াছ, তোমার লজ্জা কি ? সত্যবাদীকে বল গিয়া, আমি দিতে পারিলাম না। মিথ্যাবাদী দায়ে পড়িয়া সঙ্কুচিতভাবে সত্যবাদীর নিকট গেল এবং সকল ব্যাপার জানাইয়া বলিল

"যাহা লইয়াছেন ফিরাইয়া দিউন, নতুবা আমার নিস্তার নাই।" সত্যবাদী বলিলেন "তাহা হইতে পারে না।" মিথ্যাবাদী—"এতবার দিয়া ত ফিরাইয়া পাইয়াছি।" সত্যবাদী—তুমিই মিথ্যাবাদী, আমিত তা নই। এতবার তুমিই বলিয়াছ দিলাম"। কিন্তু "লইলাম" এ কথা একবার আমার মুখ হইতে বাহির করিতে পার নাই। এবার যে "তথাস্তু" বলিয়া স্বীকার করিয়াছি —আমি সত্যবাদী, যাহা বলিয়াছি, তাহার অন্যথা হইবে না। মিথ্যাবাদী আপনার ফাঁদে আপনি ধরা পড়িয়া সত্যবাদীর অধীন হইল। সত্যবাদী তাহাকে আপনার অসীম রাজ্য ও ঐশ্বর্য্যের অধিকারী করিলেন।

জীবনের একদিন।

(দীক্ষা)

বৈশাখী পূর্ণিমা, নিশীথকাল। রজত-ধবল-কিরণে দশ দিক্ ভাসিতেছে। পুণ্যতোয় পঞ্চনদ-বিধৌতা, পবিত্র আর্য্য ঋষিগণ-সেবিতা পুণ্যভূমিতে, পাপ-ভারা-ক্রান্ত হৃদয়ভার ও নিদাঘতাপে তাপিত দেহভার লইয়া পথপ্রান্তে বসিয়া আছি। মৃদু পবন ধীরে ধীরে বহিতেছে। প্রতি-বাসীদিগের দূরাগত মধুর-তান-লয়-সংযুক্ত মধুর হইতেও মধুরতর সঙ্গীত কর্ণকুহরে প্রবেশ করিতেছে। হৃদয় নবভাবে অভিষিক্ত হইল। অন্তরের অন্তরমধ্যে না জানি কি এক অভূতপূর্ব্ব ভাব আসিতে লাগিল। সংসারের সকলই ভুলিয়া গেলাম।

এমন সময়ে প্রতিবাসী পরিচিত বন্ধু দ্বারা অমৃতসরের স্বর্ণমন্দিরে উৎসব দর্শন নিমিত্ত অনুরুদ্ধ হইলাম। এই অনুরোধ ত্যাগ করিতে প্রাণ অগ্রসর হইল না। ধীরে ধীরে উৎসবক্ষেত্রে উৎসবের আনন্দের কথা শুনিতে শুনিতে চলিলাম। দূর হইতে স্বর্ণমন্দিরের ধীরপবন চালিত জ্যোৎস্না-ভাসিত ধ্বজা দেখিতে পাইলাম। দেখিয়াই প্রাণ নাচিয়া উঠিল। শুনিয়াছি নীলাচলস্থ জগন্নাথের উচ্চ মন্দিরের উচ্চ চূড়া দর্শনে ভক্ত দর্শকগণের ভক্তিপূর্ণ হৃদয় মাতোয়ারা হইয়া "জয় জগন্নাথ" বলিয়া উঠে। পবিত্র কাশীক্ষেত্রের বেণী-মাধবের ধ্বজা দর্শন করিয়া ভক্তগণ "জন্ম সফল" বলিয়া আনন্দাশ্রু বিসর্জ্জন করে। অবিশ্বাসী, অভক্ত হৃদয় এতদিন তাহার অর্থ হৃদয়ঙ্গম করিতে পারিত না।

আশ্চর্য্য! কি আশ্চর্য্য! আজ সকলই পরিবর্ত্তন, কি এক আন্দোলনে হৃদয় আন্দোলিত হইয়া উঠিল। স্রোতো-বাহিত তৃণের ন্যায় স্বর্ণমন্দিরের দিকে যাইতে লাগিলাম। দৃষ্টি স্বর্ণচূড়ায়, মন কোথায় কি ভাবে রহিল, তখন বুঝিতে পারিলাম না। যতই মন্দিরের নিকটবর্ত্তী হইতে লাগিলাম, যতই স্বর্ণমন্দিরের লাবণ্যচ্ছটা নয়ন-পথবর্ত্তী হইতে লাগিল;

আনন্দ-উৎসবের আনন্দধ্বনি কর্ণে বাজিতে লাগিল ; তত কতই নূতন দৃশ্য—নূতন ভাব, নূতন ছবি হৃদয়ের স্তরে স্তরে জাগিতে লাগিল।

দেখিতে দেখিতে স্বর্ণমন্দিরের দ্বারদেশে উপস্থিত হইলাম। আজ স্বর্ণমন্দিরে নূতন আসি নাই। কতবার কত উপলক্ষে আসিয়া চারিদিকের সৌন্দর্য্যে, উপাসক-বৃন্দের মুখচ্ছবিতে নূতন ছবি দেখিয়াছি; বালকণ্ঠ-নিঃসৃত সঙ্গীতের মধুময় আনন্দময় স্রোতে ভাসিয়া গিয়াছি ; কিন্তু আজ একি ? আজ সকলি যেন নূতন। যেন আজ স্বর্ণমন্দির নূতন, স্থান নূতন, জ্যোৎস্না নূতন, বাতাসও নূতন, সব নূতন ; আর নূতন হইয়া গেল এ অধমের—এ অবিশ্বাসীর হৃদয়, প্রাণ ও পোড়া চক্ষু।

সম্মুখে সুবিস্তৃত সরোবর। মধ্যস্থলে নীলজলে কৌমুদীমাখা স্বর্ণমন্দিরের স্বর্ণ ছায়া তরঙ্গের সহিত ধীরে ধীরে খেলিতেছে। আজ এ সৌন্দর্য্য ও মাধুরীর কথা বর্ণনীয় নয়, অনুভবনীয়। বৈশাখী পূর্ণিমার রজত-ধবলচ্ছটা স্বর্ণমন্দিরের স্বর্ণ অঙ্গে, শ্বেত-মর্ম্মর-প্রস্তর-গঠিত ভিত্তিতে এবং প্রাচীরাঙ্কিত লাল, নীল প্রভৃতি কতই বর্ণের ক্ষুদ্র ক্ষুদ্র প্রস্তরখণ্ডে ও নীল সরোবরের নীল জলে ক্ষুদ্র ক্ষুদ্র হীরক খণ্ড হইয়া আনন্দে যেন পাগল হইয়া খেলিতেছে। সরোবরতটবর্ত্তী শিখরাজ-প্রতিষ্ঠিত অতিথিভবন হইতে ও মন্দিরের মধ্য হইতে, মধুময় অমৃতময় সঙ্গীতস্রোত ঐ সরোবরের নীলজল সহ খেলিয়া খেলিয়া নয়ন ও শ্রবণদ্বয়কে মুগ্ধ, ও তন্ময় করিতেছে। প্রাণ—কেবল প্রাণ নহে—দেহও যেন আনন্দে উচ্ছ্বসিত হইয়া উঠিতে লাগিল। কি এক মহাকর্ষণে আকর্ষিত হইয়া যেন নাচিতে নাচিতে মন্দির অভিমুখে চলিলাম। উপাসকবৃন্দ অবনতবদনে প্রফুল্লভাবে গমনাগমন করিতেছে। নরনারীদের আজ আর ভেদ নাই; সকলেই সুসজ্জিত ; সকলেই প্রফুল্ল, সকলেরই মুখ আনন্দমাখা। লজ্জাময়ীর মুখে আজ লজ্জা নাই ; ধর্ম্মমন্দিরের মাহাত্ম্যে সর্ব্বত্র স্বর্গীয় ভাব। আজ সৌন্দর্য্যময়ী যুবতী স্বর্ণ-রজতখচিত বসন ভূষণে সজ্জিতা হইয়া সুরসুন্দরীর ন্যায় রূপচ্ছটা ছড়াইতে ছড়াইতে চলিয়াছেন, পার্শ্বস্থিত পুরুষ সসম্ভ্রমে পথ ছাড়িয়া দিতেছে। আজ যাহার আনন্দমাখা মুখপানে চাই, সেই মুখেই একটি নূতন ভাব, নূতন ছবি যেন ভাসিতেছে। আর চলিতে পারিলাম না, সমস্ত অঙ্গ অবশ হইয়া আসিতে লাগিল ; ঢুলিতে লাগিল। সরোবর-মধ্যস্থিত সেতুপরি বসিয়া পড়িলাম। আমাতে যেন আমি নাই।

যাহা হউক শীঘ্রই সে ভাব সামলাইয়া লইলাম। একবার মন্দিরের দিকে চাহিলাম, মন্দিরের হিরণ্ময়ী জ্যোতি চক্ষু ঝলসাইয়া দিল ; নভোমণ্ডলে চাহিলাম, নীলাকাশে অগণ্য হীরককুচির ন্যায় তারকারাজি জ্বল্ জ্বল্ করিতেছে। আর সরোবরের দিকে চাহিলাম, দেখিলাম, ধীর সমীরসহ তরঙ্গমালা ধীরভাবে বহিতেছে। যে দিকে

চাহি, সেই দিকই সুন্দর। আজ সৌন্দর্য্যের মেলা বসিয়াছে। আশেপাশে উর্দ্ধে অধোতে সকলই আজ সুন্দর।

আজ সকলই কেন সুন্দর? আজ কেন সকলই নূতন, সকলই আনন্দপ্রদ, মনোমধ্যে কেন এমন হইল? আজ কি জীবনের মাহেন্দ্রক্ষণ, শুভসময়? অ-বিশ্বাসী অভক্ত, অহঙ্কৃত, পাপী জীবনের কি নবভাবের উদ্দীপনের দিন? ধর্ম্মের মাহাত্ম্য, ঈশ্বরের ঐশ্বর্য্যের গৌরব, ভক্তের মহত্ব কিছুইতো জানি না, কখনই অনুভব করি নাই—সকলই যেন নবভাবে আসিতেছে! কেবল স্থানীয় সৌন্দর্য্য এত মাতাইতে—বিভোর করিতে পারে না। সৌন্দর্য্যের অতীত কিছু নিশ্চয়ই আছে। তবে সে কি? হৃদয়ের মধ্যে চাহিলাম, কিছুই পাইলাম না। উর্দ্ধ দিকে চাহিলাম দেখি দেখি কোন দেবতা কি কৃপাবশে এ পাপীর নবজীবন দানের জন্য আবির্ভূত হইলেন। কৈ না, কিছুই নহে।

ভাবিলাম, কতকাল হইল, শিক্ষাগুরু বাবা রামদাস এই স্থানে বসিয়া প্রাণ ঢালিয়া, প্রাণের প্রাণ পরম দেবতার ধ্যান ধারণায় সাধন ভজনে প্রাণের মধ্যে যে অমৃত লাভ করিয়াছিলেন, সেই অমৃত-স্রোত আজও কি এই ধর্ম্মমন্দিরে বর্ত্তমান রহিয়াছে? সেই জন্যই কি ইহা সিদ্ধপীঠ হইয়াছে? তার পর গুরুবংশীয়েরা—গুরু-স্থানীয় মহাত্মাগণ কতকাল ধরিয়া, হৃদয় ভরিয়া হৃদয়ের হৃদয়কে সেই স্রোতে ভাসাইবার জন্য কতই সাধন ভজন করিয়াছেন! কত যুগযুগান্তর অতিবাহিত হইল, কালের কত পরিবর্ত্তন হইল, কিন্তু সেই অমৃতস্রোত আজও কি সমভাবে বহমান রহিয়াছে! দেবগণ ঘোরতর সংগ্রামে অমৃত লাভ করিয়া নিজেরা অমর হইলেন, কিন্তু সাধুরা কঠোর সাধন ভজনে যে অমৃত লাভ করিলেন, তাহা কেবল নিজেরা ভোগ করিয়া নিজে অমর হইবার জন্য রাখিলেন না, জগতের পাপী তাপীর নবজীবনের জন্য রাখিয়াছেন। তাই এই অমৃতসরের উদ্ভব। তাই অমৃতসরের গৌরব ও মাহাত্ম্য। ভক্ত যে স্থানে বসিয়া ভক্তির ধনকে লাভ করিবার জন্য আত্ম-বলিদান করেন, সেই স্থানতো অমৃতক্ষেত্র। সেই স্থানে আসিলে প্রাণ মত্ত হয়, আপনাকে ভুলিয়া, জগৎ ভুলিয়া সংসারাতীত, জ্ঞানাতীত কোন্ স্থানে যাইবার জন্য প্রস্তুত হয়। অমৃতসর কি তাই? কত দিন হইতে কত ভক্ত প্রাণের ভক্তি-বিশ্বাস-অনুরাগের সহিত ভক্তবৎসলের নিকট, প্রাণের বেদনা, মনের জ্বালা জুড়াইবার জন্য আসিয়া সফল-কাম হইয়াছেন। ঐ পঞ্চনদের অনন্ত প্রবাহের ন্যায় প্রেম ভক্তির স্রোত কত দিন বহিতেছে! তাই আজও অমৃতসরের অমিয়শ্ব—সাধকের সাধনার ফল লোপ পায় নাই। সেই আনন্দ-অমিয়স্রোত সকলকে মাতাইতেছে—জীবিত রাখিয়াছে। তাই উপাসকবৃন্দ প্রাতে, মধ্যাহ্নে, অপরাহ্ণে, রজনীতে আনন্দময়ের, অমৃতময়ের,

প্রেমময়ের পূজার জন্য বিনীতভাবে, প্রফুল্লবদনে রাজরাজেশ্বরের দরবারে আসিয়া থাকে। সেই সুন্দরভাব দেখিবার জিনিস। নর-নারী ধীরে ধীরে আসিতেছে, মন্দির প্রদক্ষিণ করিতেছে, গোলাপ পুষ্প অঞ্জলি দিতেছে, অমৃতসরের জল স্পর্শ করিয়া চলিয়া যাইতেছে। এমন চির-জীবন্ত, চির-জাগ্রত ধর্ম্মক্ষেত্র আর কোথায় আছে কি না, জানি না। প্রেম-ভক্তির এমন উৎসব আর কোথায় আছে কি না, তাহাও জানি না।

বৈশাখী পূর্ণিমার ললিত-মধুর সৌন্দর্য্যে জানি না—আজ কোনও মহাত্মার মাহাত্ম্য-বিরাজের দিন কি না। এই ধর্ম্মক্ষেত্র নবভাবে আমার হৃদয়ক্ষেত্রকে অভিষিক্ত করিবার জন্য কি এই উন্মাদকরূপে আমাকে টানিয়া আনিল? ধর্ম্ম কি, ধর্ম্মের স্বরূপ কি, জানিতাম না। ধর্ম্মের মাহাত্ম্য কি জানিতাম না। ঈশ্বরের স্বরূপ কি, সাধন ভজন কি, তাহার প্রণালী কি, বুঝি নাই, জানি নাই, জানিবার চেষ্টাও ছিল না। বিশ্বাসহীন, ভক্তিহীন, প্রেমহীন হৃদয়ে সংসারে থাকিতাম। কিন্তু আজ যেন কিসের আকর্ষণে আকৃষ্ট হইয়া সকলি বিপর্য্যস্ত হইয়া পড়িল।

মন্দিরাভ্যন্তরে আশাপূর্ণহৃদয়ে চাহিয়া দেখিলাম, স্বর্ণসিংহাসনে "গ্রন্থ সাহেব" কৌষেয় বস্ত্রাচ্ছাদিত হইয়া বিরাজমান —গোলাপ পুষ্পাভরণে বিভূষিত। চারি দিক্ আলোকমালায় উজ্জ্বল। প্রতিমা নাই; আছে গুরুনানকের সাধন-সাগরোদ্ভূত অমৃতময় প্রাণপ্রদ গ্রন্থ। এই গ্রন্থই শিখজাতি—শিখজাতি কেন—সমস্ত সাধক জগতের পক্ষেই অমূল্য বস্তু। সকলেই জীবন্ত সত্য—জীবন্ত প্রেম যেন ইহার মধ্যে মূর্ত্তি ধরিয়া আছে, বলিয়া বিশ্বাস করে; সেই স্তোত্র শুনিয়া, গাহিয়া, জীবনকে কৃতার্থ জ্ঞান করে।

ধীরে ধীরে মন্দিরের নিকটবর্ত্তী অলিন্দ উপরি বসিলাম। গন্ধদীপ হইতে সুরভি-স্রোত আসিতেছে, তাহার সহিত ললিত মধুর সঙ্গীতস্রোত বহিতেছে। কর্ণকুহর অভিষিক্ত করিয়া প্রাণ মন প্লাবিত করিয়া সেই স্রোত বহিতে লাগিল। সঙ্গীতের এক একটি শব্দ হৃদয়ের পরতে পরতে খেলিয়া খেলিয়া যেন বেড়াইতে লাগিল। সঙ্গীত কি মধুর; কি প্রাণ মন উন্মাদকর! সঙ্গীতের ভাবটী—(কতদিন অতিবাহিত হইল)—এখনও প্রাণে যেন জাগিতেছে, মনে পড়িলেই শরীর ভাবে কণ্টকিত হইয়া উঠে। ক্রমে ক্রমে জগতের কত ঘটনা, কত কথা ভুলিতেছি; কিন্তু এই মন্দির, এই বৈশাখী পূর্ণিমা, এই সঙ্গীতটী ভুলিবার নহে। সংসারতাপে তাপিত হইয়া যখন আকুল হই, অমনি ইচ্ছা করি, সকল বন্ধন ছেদন করিয়া গুরু-দরবারের মহারাজাধিরাজের সিংহাসনে উপস্থিত হইয়া প্রাণের জ্বালা মিটাই।

সে সঙ্গীতের প্রত্যেক শব্দটী মনে নাই; কিন্তু ভাবটী এখনও প্রাণে

জাগিতেছে। সঙ্গীতটি এই :—"হে প্রাণারাম! তুমি আমার সব। তুমি হৃদয়ের আলো; প্রাণের প্রাণ; অমৃতের প্রস্রবণ, আনন্দের খনি! তোমাকে যদি না পাইলাম; তবে জীবনে প্রয়োজন কি? হে অমরজীবনদাতা! দেখা দেও। তোমাকে লইয়া সংসারে থাকি; আর কিছু চাহি না।" সে সময়ে তীক্ষ্ণ শলাকার ন্যায় সঙ্গীতের প্রতি শব্দ হৃদয়ে প্রবেশ করিয়া অন্তরের অন্তরপ্রদেশ বিদ্ধ করিয়াছিল। ভাবসাগরে ডুবিয়া যাইতে লাগিলাম। দৈববাণীর ন্যায় কর্ণকুহরে কি প্রবেশ করিতে লাগিল। দেহ লোমাঞ্চিত হইল, নয়নে অশ্রু বহিতে লাগিল, অনিমেষ-লোচনে চাহিয়া রহিলাম। আব্রহ্ম স্তম্ভ পর্য্যন্ত সে ধ্বনির প্রতিধ্বনি হইতে লাগিল। সমস্ত মন্দির যেন মাতিয়া উঠিয়াছে! আজ গুরুদরবার সত্য সত্যই গুরুদরবার হইল।

তখন কতই ভাব মনে রাজত্ব করিতে লাগিল। স্থির মনে স্থিরভাবে কতই কথা উদিত হইল। ঠাকুর! যথার্থই তুমি প্রাণারাম, তোমার নাম শ্রবণে এত আরাম, পূর্ব্বে তো জানি নাই, অনুভব করি নাই; তুমি প্রাণের, মনের আঁধার দূর কর, ইহাও সত্য। তোমার নাম গানে মৃত প্রাণ জাগিয়া উঠে, ইহাও সত্য; তোমার নামই অমৃত; তোমার নামে রোগ, শোক, পাপ তাপ বিদূরিত হয়। কে বলে সংসার অসার, মায়াপূর্ণ, শোকতাপ-বিজড়িত!! তুমি সংসারাতীত হইয়াও সংসার-লীলাময়। সংসারে যদি তোমাকে না পাইলাম, সংসারে যদি তোমাকে রাজ-রাজেশ্বররূপে বিরাজিত না দেখিলাম, সংসার-লীলায় যদি তোমার লীলা না দেখিলাম, তবে আঁধার ক্ষেত্রে ঘুরিবার প্রয়োজন কি? জয়দেব! তোমার অনন্ত লীলা আজ দেখিলাম। অনন্তলীলা-রসময় তুমি দেব! আজ জীবন সার্থক হইল।

আজ বুঝিলাম, মনুষ্যের মধ্যে—ভক্তের মধ্যে তুমি। তোমার স্বরূপ বিশ্বব্রহ্মাণ্ডে নাই। জাগ্রত জীবন্ত ভাবে তোমার স্বরূপ যদি দেখিতে হয়, এবং তৎস্বরূপে স্বরূপত্ব লাভ করিতে হয়, তবে প্রাণের মধ্যে কে যেন বলিতেছে অবিশ্বাস্য নহে, সত্য-সত্যই—ঐ ভক্তের মধ্যে লীলা-রসময় হরি, তাঁহার রাসমন্দির ভক্তহৃদয়ে। আর বুঝিলাম, ভক্তের সাধনক্ষেত্রই মহাতীর্থ। সেই ক্ষেত্রে, সেই নাম-সাধন-ক্ষেত্রে শ্রীহরির আবির্ভাব হয়। প্রভু চৈতন্যদেবের বাক্য আজ সত্য বলিয়া বুঝিলাম। "যে স্থানে হরিনাম, সেই স্থানে শ্রীহরি"। ভক্তের হৃদয়ক্ষেত্র তাঁহার লীলাক্ষেত্র, আনন্দভূমি, লহরীলীলাময় অমৃতসাগর। আজ প্রাণ ভরিয়া বলিতে পারি, তুমি বিশ্বাস কর না কর, যদি সচ্চিদানন্দময় শ্রীহরির লীলাস্থান, প্রকট-স্থান, স্বরূপস্থান বাহ্য জগতে দেখিতে চাহ, তবে এই স্থানেই দেখিতে পাইবে; যদি উপভোগ করিতে চাহ, নামক্ষেত্রে প্রাণ ভরিয়া উপভোগ করিবে। ইহাই ধর্ম্মক্ষেত্র,

ইহাই স্বর্গভূমি। এ স্থানে কামনার স্থান নাই, আশার স্থান নাই ; আছে উপভোগ। এই মহাসত্য প্রাণের মধ্যে লাভ করিলাম। জীবনে নবজীবন লাভ হইল।

শ্রীতাঃ।

শিক্ষিতা মহিলার দায়িত্ব।

সর্ব্বত্রই চিন্তাশীল লোকের সংখ্যা অত্যন্ত কম, চিন্তাবিহীন লোকের সংখ্যাই অনেক বেশী। এইজন্য অধিকাংশ লোকের মধ্যেই উদারতার অপেক্ষা সঙ্কীর্ণতাই অধিক পরিমাণে লক্ষিত হইয়া থাকে। মানুষ বাল্যাবধি সমাজের নিকট এমন অনেক শিক্ষা ও সংস্কার প্রাপ্ত হয় যে, উহা তাহার মনকে ক্ষুদ্রতার সীমার মধ্যে রুদ্ধ করিয়া রাখে। একমাত্র চিন্তাশক্তি সেই মনকে ক্ষুদ্রতার সীমা হইতে অসীম সত্যের দিকে লইয়া যায়। মানুষ স্বীয় চিন্তাশক্তির প্রভাবেই সত্যের স্বরূপ বুঝিতে পারে, এবং সত্যের সমাদর করিতে সমর্থ হয়। কিন্তু চিন্তাবিহীন লোকেরা আপনাদের ক্ষুদ্রতার সীমা অতিক্রম করিতে পারে না। সত্যের সাক্ষাৎকার, সত্যের প্রতি সম্মান প্রদর্শনও তাহাদের পক্ষে অসম্ভব হইয়া উঠে ; তাহাদের মন সঙ্কীর্ণতার তমোজালেই আচ্ছন্ন হইয়া থাকে। এজন্য যাঁহারা তাঁহাদিগের নিকট কোন নূতন সত্য প্রচার করিতে যান, কোন নূতন দৃশ্য দেখাইতে যান, এবং কোনও নূতন কার্য্য করিতে উদ্যোগী হন, তাঁহাদের দায়িত্ব অতি গুরুতর। কারণ চিন্তাবিহীন ব্যক্তিদিগকে সহস্র যুক্তি তর্ক দ্বারাও যদি সেই সকল সত্যের সত্যতা, সেই সকল দৃশ্যের সৌন্দর্য্য, এবং সেই সকল কার্য্যের উপকারিতা বুঝাইয়া দেওয়া যায়, তথাপি তাঁহাদের চির-সঞ্চিত সংস্কার তাঁহাদিগকে বিভ্রান্ত করিয়া রাখে। তাঁহারা উহা বুঝিয়াও বুঝিতে পারেন না। বরং এক প্রকার অন্ধ ভয় বশতঃ ঐ সকলের অত্যন্ত বিরোধী হইয়া উঠেন।

কিন্তু যাঁহারা নূতন সত্য প্রচার করিতে যান, নূতন কিছু কার্য্য করিতে যান, তাঁহারা যদি তাঁহাদের প্রচারিত সত্যের সফলতা এবং কার্য্যের ফলোপধায়িতা আপন আপন জীবনে ও স্ব স্ব সম্প্রদায় মধ্যে দেখাইতে পারেন, তাহা হইলে বিরোধী ব্যক্তিদিগের চক্ষু প্রস্ফুটিত হয়। তাঁহারা যে কার্য্যের উপকারিতা যুক্তি তর্কের দ্বারা বুঝিতে পারেন নাই, সেই কার্য্যের সুফল সমাজে প্রত্যক্ষ করিয়া পরিতুষ্ট ও তাহার পক্ষপাতী হন ; এবং ভ্রম কুসংস্কার পরিত্যাগপূর্ব্বক নূতন সত্যই গ্রহণ করেন, নূতন কার্য্যেই ব্রতী হন।

এই জন্তই আমরা অনুভব করিতেছি, এদেশে শিক্ষিতা রমণীর দায়িত্ব বড়ই গুরুতর। কারণ যদিও ঋগ্বেদের সময় বিশ্ববারা প্রভৃতি রমণী ঋষিগণ বেদমন্ত্র রচনা করিতেন, এবং উপনিষদের সময় ব্রহ্মবাদিনী গার্গী যজ্ঞসভায় উপস্থিত থাকিতেন, বড় বড় ঋষির মুখপাত্রী হইয়া যাজ্ঞবল্ক্যের তুল্য প্রবীণ পণ্ডিতের সঙ্গে জ্ঞান-বিচার করিতেন, তথাপি বর্ত্তমান কালে স্ত্রীশিক্ষা একপ্রকার নূতন সূচনা। এ দেশের অধিকাংশ চিন্তাবিহীন ব্যক্তিই ইহার বিরোধী বা ইহার প্রতি উদাসীন।

তবে কেহ কেহ হয় ত বলিবেন, যাঁহারা বিরোধী, তাঁহাদের বিরোধভঞ্জনেরও চেষ্টা করা হইয়াছে, স্ত্রীশিক্ষার আবশ্যকতা তাঁহাদিগকে উত্তমরূপেই বুঝাইয়া দেওয়া হইয়াছে; এবং এখন এ দেশে রমণীদিগের উচ্চ শিক্ষাও প্রচলিত হইয়াছে।

উচ্চ শিক্ষা যে প্রচলিত হইয়াছে, তাহাতে আর সন্দেহ নাই। কিন্তু উচ্চ শিক্ষার স্রোত ক্ষীণকায়া নির্ঝরিণীর সূক্ষ্মধারার ন্যায় ধীর গতিতেই চলিয়াছে। যদিও জানি এই ধীরগতি কখনই বন্ধ হইবার নহে, তথাপি আশঙ্কা হয়, কবে কোথা হইতে কোন্ মৃত্তিকাস্তর পতিত হইয়া স্রোতের এই ক্ষীণ গতি রুদ্ধ করিয়া ফেলিবে; এবং এই ক্ষীণ স্রোত দেখিয়াই স্পষ্ট বুঝিতে পারা যায় রমণীদিগের উচ্চ শিক্ষার আবশ্যকতা এখনও এ দেশের অধিকাংশ লোকেই বুঝিতে পারেন নাই। স্ত্রীশিক্ষা সম্বন্ধে তাঁহাদের মনে যে চিরসঞ্চিত কুসংস্কার আছে, তাহাও বিদূরিত হয় নাই। তাঁহারা এখনও বিশ্বাস করেন রমণীদিগের উচ্চ শিক্ষা দ্বারা সমাজে সুফলের পরিবর্ত্তে কু-ফলই উৎপন্ন হইবে। এই জন্য তাঁহাদের হৃদয় স্ত্রীশিক্ষার সম্পূর্ণ বিরোধী; অনেকে স্ত্রীজাতির উচ্চ শিক্ষা উঠাইয়া দিবার জন্যই বদ্ধপরিকর।

কাজেই এ শ্রেণীর বিরোধী লোকদিগের কু সংস্কার দূর করিবার জন্য, এবং স্ত্রীশিক্ষার সুফল বুঝাইয়া দিবার জন্য শিক্ষিতা রমণীদিগের অনেক দায়িত্ব ও অনেক কর্ত্তব্য আছে।

প্রথমতঃ অনেক মার্জ্জিতবুদ্ধি শিক্ষিত ব্যক্তিও মনে করেন, হিন্দু রমণীর অতুলনীয় পতিভক্তি, অনুপম সেবাপরায়ণতা শিক্ষা দ্বারা বিনষ্ট হইবে। যদিও ইংরাজের তুলনায় হিন্দুর গৃহে পারিবারিক বিশুদ্ধ আমোদ ও আহ্লাদের যথেষ্ট বন্দোবস্ত নাই, এবং পার্থিব সুখ স্বচ্ছন্দেরও যথেষ্ট অভাব আছে, তথাপি হিন্দু রমণীর পুণ্য ও পবিত্রতায়, শ্রমশীলতায় ও নিষ্কাম সেবাপরায়ণতায় হিন্দুর গৃহ স্বর্গতুল্য। এখানে রমণীরা বাল্যকালে জননী, খুল্লতাতপত্নী এবং ভ্রাতৃজায়াদিগকে দেখিতে পান, তাঁহারা স্বামীকে ইহ ও পরকালের দেবতা বলিয়া মনে করেন; শরীরের আরাম ও মনের সুখ একেবারে বিস্মৃত হইয়া, স্বামীর একান্নবর্ত্তী পরিবারের রন্ধনাদি সর্ব্বপ্রকার শ্রমের কার্য্য প্রসন্নচিত্তে সম্পন্ন করেন।

কাজেই তাঁহারা পরিণয়ের পর স্বামিগৃহে গমন করিয়া পিতৃগৃহের আত্মীয়াদিগের নিকট যে শিক্ষা পাইয়াছেন, সেই শিক্ষারই অনুকরণ করেন। তজ্জন্য নবপরিণীতা পত্নীদিগের আবির্ভাবে গৃহের কোনও প্রকার অশান্তি অথবা বিশৃঙ্খলা উপস্থিত হয় না, স্বামীকে স্ত্রীর সুবিধা অসুবিধা চিন্তা করিয়া পিতা মাতা ও ভ্রাতা ভগিনীর সুমিষ্ট সংসর্গ বিচ্ছিন্ন করিতে হয় না এবং একমাত্র পত্নীকে লইয়া দূরস্থিত স্বতন্ত্র বাসস্থানে বাস করিবার প্রয়োজনও অধিক হয় না।

কিন্তু রমণীদিগকে শিক্ষা দিলেই স্বাধীনতাও দিতে হইবে। যাঁহারা মনে করেন রমণীদিগকে শিক্ষাও দিব, এবং পূর্ব্বের ন্যায় খেলার পুতুল করিয়াও রাখিব, তাঁহাদের তুল্য ভ্রান্ত আর কে? শিক্ষার যদি কোন কার্য্য থাকে ত সে স্বাধীনতা। অবশ্য ট টা টি টী শিক্ষা দিলে সে কথা খাটিত না। কিন্তু তাহা ত নয়। রমণীদিগকে শিক্ষা দিলে উচ্চ শিক্ষাই দিতে হইবে। উচ্চ শিক্ষার অর্থই ইংরাজী শিক্ষা। ইংরাজী শিক্ষায় যুবকদিগকে কি প্রকার সমাজদ্রোহী করিয়া তুলিয়াছে, তাহা কে না জানে? রমণীরা এই ইংরাজী শিক্ষা পাইলেই পাশ্চাত্য সমাজের দিকে তাঁহাদের দৃষ্টি পড়িবে। পাশ্চাত্য রমণীদিগের তুলনায় আপনাদিগকে সুখ-সৌভাগ্যে সম্পূর্ণ বঞ্চিত বলিয়া মনে করিবে; এবং সেই সেই সুখ সৌভাগ্যের অধিকারিণী হইবার জন্য সমাজে বিদ্রোহ ও দারুণ বিশৃঙ্খলা আনিয়া ফেলিবে। সুতরাং স্ত্রীশিক্ষায় সমাজের সর্ব্ববিধ অকল্যাণই উৎপন্ন হইবে।

এই সকল একদেশব্যাপী দুর্ব্বল যুক্তির উপর নির্ভর করিয়া যাঁহারা স্ত্রীশিক্ষার বিরুদ্ধাচরণ করেন, তাঁহারা কেবল পুরুষ-দিগের সুখ সুবিধার প্রতি দৃষ্টি রাখিয়াই কথা বলেন, স্ত্রীজাতির সুখ সৌভাগ্যের অপেক্ষা বর্ত্তমান সমাজ-শৃঙ্খলা রক্ষা করাই অধিকতর শ্রেয়স্কর মনে করেন। শিক্ষিতা রমণীরা এইরূপ চিন্তা করিয়া যদি ঐ সকল রক্ষণশীল ব্যক্তিদিগের বাক্যের প্রতি উপেক্ষা প্রদর্শন করেন, তাহা হইলে কোনই লাভ হইবে না। কিন্তু শিক্ষিতা মহিলাদিগকে তাঁহাদের জীবনের ক্ষুদ্র বৃহৎ ঘটনা দ্বারা সপ্রমাণ করিতে হইবে,—তাঁহারা মার্জ্জিত শিক্ষা দ্বারা যে নির্ম্মল সত্যালোক প্রাপ্ত হইয়াছেন, সেই সত্যালোকে অনুপ্রাণিত হইয়া এবং বিবেকের আজ্ঞানুবর্ত্তিনী হইয়া সমাজের অনিষ্টকর কুপ্রথাগুলির নিকট মস্তক অবনত করিতে অসম্মত। তদ্ভিন্ন পাশ্চাত্য কুহকে আচ্ছন্ন হইয়া, অথবা কেবলমাত্র পার্থিব সুখের প্রবৃত্তি দ্বারা পরিচালিত হইয়া তাঁহারা সমাজমধ্যে কোন প্রকার বিদ্রোহ ও বিশৃঙ্খলা আনয়ন করেন নাই, বরং সমাজমধ্যে এক সংস্কৃত অত্যুন্নত আদর্শই লইয়া আসিয়াছেন। তাহাতে প্রাচীন পতিভক্তির কুসংস্কারটুকু চলিয়া গিয়াছে বটে, কিন্তু প্রকৃত প্রেম জিনিসটি স্ফটিকের ন্যায় শুভ্র হইয়া ফুটিয়াছে।

তাঁহারা এখন আর স্বামীর দাসী নহেন, এ কথা সত্য; কিন্তু শিক্ষিত স্বামী পত্নীর কাছে যে সকল সদ্গুণের প্রত্যাশা করেন, তাহা তাঁহাদিগের মধ্যে পূর্ণভাবে বিদ্যমান। তাঁহারা যেমন হিন্দুরমণীর তুল্য পতির প্রতি অনুরাগিণী, তেমনি ইংরাজ ললনার ন্যায় ধর্ম্মে স্বামীর সহধর্ম্মিণী, কর্ম্মে স্বামীর সঙ্গিনী, ও ব্যবহারে স্বামীর হৃদয়ানন্দদায়িনী।

দ্বিতীয়তঃ, শিক্ষিতা রমণীদিগের আর একটি বিষয় দেখাইবার আছে। বিষয়টী অত্যন্ত গুরুতর। পূর্ব্বে ইহার উল্লেখও করিয়াছি; এ স্থানে তদ্বিষয়ে কিঞ্চিৎ আলোচনায় প্রবৃত্ত হইতেছি। স্ত্রীশিক্ষার বিরোধী এবং স্ত্রীশিক্ষার পক্ষপাতী লোকদিগেরও এই একটি ভয় আছে যে, শিক্ষিতা মহিলারা পাশ্চাত্য সাহিত্য অনুশীলন করিয়া পাশ্চাত্য রমণীর আদর্শে কিয়ৎ পরিমাণে আপনার সুখ সুবিধা ও খুঁটি নাটি লইয়া ব্যস্ত থাকিবেন, সম্পূর্ণরূপে নিজের ইচ্ছা ও রুচি অনুসারে চলিতে চাহিবেন। ইহাতে এদেশের একান্নবর্ত্তী পরিবার-প্রথা ভাঙ্গিয়া যাইবে, একমাত্র স্ত্রীর জন্য পুত্র পিতামাতার নিকট হইতে দূরে চলিয়া যাইবে, ভাইভগিনীর সুখে উদাসীন হইবে, আশ্রয়বিহীন স্বজনেরা উপার্জ্জনক্ষম আত্মীয়দিগের সাহায্য হইতে বঞ্চিত হইবে।

নিশ্চয়ই আমরা জানি যে, এই উক্তি অত্যন্ত পুরাতন। কিন্তু পুরাতন হইলেও বিষয়টী এখন একবার নূতনভাবে আলোচনা করা কর্ত্তব্য। কারণ এক সময় আমরা অনেকেই একান্নবর্ত্তী পরিবার-প্রথা অনিষ্টকর বলিয়া অনুভব করিয়াছিলাম। এখন দেখিতেছি, একান্নবর্ত্তী পরিবার-প্রথা আমাদের অবস্থার পক্ষে এমন উপযোগী, আমাদের প্রকৃতির পক্ষে এমন স্বাভাবিক, আমাদের প্রাণের পক্ষে এমন আনন্দদায়ক যে, আমরা বিবাহ করিয়া পত্নীকে লইয়া পিতা মাতা অথবা ভাই ভগিনীর নিকট হইতে দূরে চলিয়া যাইব, স্বতন্ত্র স্থানে স্বতন্ত্রভাবে বাস করিব, ইহা চিন্তা করিতেও মনে অত্যন্ত বেদনা অনুভব করি। তা'ছাড়া স্বতন্ত্রবাস আমাদের অবস্থার পক্ষে উপযোগী নয় বলিয়াই মনে করি। কারণ ইংরাজদিগের ন্যায় আমাদের অবস্থা সচ্ছল নহে। আমরা যে কিছু উপার্জ্জন করি, তদ্দ্বারা বৃদ্ধ পিতা মাতার সাহায্য করিতে হয়, ভাই ভগিনীর সাহায্য করিতে হয়, নহিলে চলে না। ইংরাজদিগের ন্যায় আমাদিগের বৃদ্ধ পিতার গৃহে সঞ্চিত অর্থ থাকে না, শরীরেও পরিশ্রমের শক্তি থাকে না; তাঁহারা উপার্জ্জনে সম্পূর্ণ অক্ষম হইয়া পড়েন। সুতরাং আমরা যদি তাঁহাদের সাহায্য না করি, তাঁহাদের সেবা না করি; আমরা যদি অল্পবয়স্ক ভাই ভগিনীর সুখ দুঃখে উদাসীন হই, তাহা হইলে এই বাঙ্গালী সমাজ কি ধ্বংসের অভিমুখেই ধাবিত হইবে না?

যদি বল, তাঁহাদিগকে অর্থ সাহায্য করিব না কেন? আমি আমার স্ত্রীপুত্র

লইয়া আমাদের ইচ্ছা ও রুচি অনুসারে স্বতন্ত্র স্থানে বাস করিব বটে, কিন্তু পিতা মাতা ও ভাই ভগিনীদিগকে অর্থ দ্বারা সাহায্য করিব।

তাহা হইলে বলি, বৃদ্ধ পিতা মাতার সেবা করিবে কে? যদি সেবার কথা ছাড়িয়াও দিই, তথাপি আমাদের অধিকাংশ লোকের আয় যেরূপ অত্যল্প, তাহাতে স্বয়ং স্ত্রীপুত্র লইয়া স্বতন্ত্র স্থানে বাস করিব, তাহার সমস্ত খরচ চালাইব, তাহার উপর পিতা মাতা ও ভ্রাতাদিগের জন্য একটী স্বতন্ত্র বাসা করিয়া দিব, তাহারও খরচ চালাইব; ইহা কখনই সম্ভব হইতে পারে না। তা'ছাড়া এদেশে ইয়ুরোপের মত সর্ব্বসাধারণের জন্য এমন সকল হোটেলও নাই, যেখানে গিয়া সকলেই নিজ নিজ স্বেচ্ছা ও রুচি অনুসারে বাস করিতে পারি। সুতরাং আমাদিগকে বাধ্য হইয়াই এক বাড়ীতে পিতা, মাতা ও ভাই ভগিনীর সঙ্গে স্ত্রীপুত্র লইয়া বাস করিতে হয়। ইহাতে শুধু যে আমরা পরস্পর পরস্পরের প্রীতি ও ভক্তি পাইয়া, গুরুজনের পরিচর্য্যা করিয়া কৃতার্থ হই, তাহা নহে। আমরা দুই তিন ভাই মিলিয়া যে সামান্য অর্থ উপার্জ্জন করি, তাহাতেই সুখে স্বচ্ছন্দে আমাদের সংসার-যাত্রা নির্ব্বাহ হয়। আমাদের বাড়ীভাড়া, চাকর, চাকরাণী ও রাঁধুনীর বেতন সকলই খুব কম পড়ে; অথচ কাহারও প্রতি কোন প্রকার কর্ত্তব্যও অসম্পন্ন থাকে না।

তবে এই একান্নবর্ত্তী পরিবার-প্রথা দ্বারা যে কোনপ্রকার কুফল উৎপন্ন হয় না, তাহা বলিতে পারি না। অধিক লোক এক সঙ্গে থাকিলে গৃহের শান্তি যে কিয়ৎ পরিমাণে নষ্ট হয়, রমণীদিগের মধ্যে ক্ষুদ্র ক্ষুদ্র বিষয় লইয়া যে কলহ ও মনোমালিন্য উপস্থিত হয়, এবং চিন্তাশীল ব্যক্তিদিগের অধ্যয়ন ও চিন্তার যে কিঞ্চিৎ ব্যাঘাত ঘটে, তাহা অস্বীকার করিতে পারি না। কিন্তু এই সকল অনিষ্টের সম্ভাবনা সত্ত্বেও দরিদ্র এবং মধ্যবিধ অবস্থার লোকদিগের একান্নবর্ত্তী পরিবারে বাস করা ভিন্ন গত্যন্তর নাই।

তবে যে সকল স্ত্রৈণ যুবক একমাত্র শিক্ষিতা বা অশিক্ষিতা স্ত্রীর সুখ সুবিধা ও নিজের আত্মতৃপ্তিকেই জগতের শ্রেষ্ঠ ব্যাপার বলিয়া মনে করেন; পাছে বা পত্নী তাঁহার কুসুম-কোমল প্রাণে ঈষৎ আঘাত পাইয়া ব্যথিত হন, এই চিন্তায় অধীর হইয়া পড়েন, এবং অল্প আয় সত্ত্বেও জনক জননী হইতে বিচ্ছিন্ন হইয়া জনক জননীর স্মৃতি পর্য্যন্ত হৃদয় হইতে বিলুপ্ত করিতে চাহেন, তাঁহাদের কথা স্বতন্ত্র। আমরা সেই সকল যুবককে ধিক্কার দিয়া বলিতে বাধ্য হইতেছি, এখনও এদেশে একান্নবর্ত্তী পরিবার-প্রথা অনিবার্য্য। সুতরাং শিক্ষিত মহিলাদিগকেও অন্য কাহারো সঙ্গে না হউক, শ্বশুর শাশুড়ী ভাসুর দেবর ও যা-দিগের সঙ্গে যে একত্র বাস করিতে হইবে, তাহাতে আর সন্দেহ নাই।

অতএব উচ্চশিক্ষিতা রমণীদিগকে দেখাইতে হইবে, তাঁহারা ইংরাজী শিক্ষা পাইয়াও পাশ্চাত্য বিলাস-কুহকে মুগ্ধ হইয়া যান নাই, জ্ঞানগর্ব্বিতা ঐশ্বর্য্য-দর্পিতা রমণীদিগের নির্লজ্জ পরিচ্ছদ ও প্রমোদেরও অনুসরণ করেন নাই, তাহাদের প্রার্থিত ভোগ সুখেরও প্রত্যাশা রাখেন না। তাঁহারা হিন্দু রমণী ছিলেন, এবং এখনও হিন্দুগৃহেরই শিক্ষিতা রমণী আছেন। সুতরাং হিন্দু রমণীর শ্রমশীলতা, সহিষ্ণুতা, ও সেবাপরায়ণতা প্রভৃতি সদ্গুণসমূহ তাঁহাদের মধ্যে পূর্ণভাবেই বিরাজিত আছে। প্রয়োজন হইলেই তাঁহারা আপনাদের ইচ্ছা ও রুচিকে বিসর্জ্জন দিয়া, সুখ ও আরামের প্রবৃত্তিকে চরণে দলিত করিয়া, অম্লানচিত্তে শ্বশুর শাশুড়ীর পরিচর্য্যা করিতে পারেন, ভাসুর ও দেবরদিগকে সুখী করিতে পারেন, এবং যা-দিগের সঙ্গে প্রাণে প্রাণে মিলিত হইয়া গৃহের শান্তি ও শৃঙ্খলা রক্ষা করিতে পারেন।

প্রবন্ধ দেখিতেছি ক্রমশঃই দীর্ঘ হইয়া চলিল। কাজেই রমণীদিগের সন্তান-পালন, ও সন্তানদিগের সুশিক্ষা বিধান সম্বন্ধে যাহা বলিবার ছিল, তাহা আর এ প্রবন্ধে বলা হইল না। এখন কেবল একটি কথা বলিয়া এই প্রবন্ধের উপসংহার করিব।

শিক্ষিতা রমণীরা যেন মনে না করেন যে, ঐ যে ভাগীরথীর জলস্রোত খরবেগে সমুদ্রাভিমুখে বহিয়া চলিয়াছে, উহার গতিকে পর্ব্বতাভিমুখে লইয়া যাওয়া যেমন অসম্ভব, তেমনি রমণীর উচ্চশিক্ষা স্রোতকেও বন্ধ করা একেকালে অসম্ভব। কাজেই একবার হাড়ভাঙ্গা খাটুনি খাটিয়া বিশ্ববিদ্যালয়ের পরীক্ষায় উত্তীর্ণ হইয়া আবার প্রাণপণ করিয়া সমাজের কাছে সাংসারিক পরীক্ষা দেওয়া নিষ্প্রয়োজন।

তাঁহাদের মনে রাখা উচিত, রমণীর উচ্চ শিক্ষার স্রোত বন্ধ করা অসম্ভব হইলেও ক্ষীণ করিয়া রাখা অসম্ভব নহে। ইহা যে কেবল অনুমান করিয়া বলিতেছি, তাহা নহে, ইহার পূর্ব্ব লক্ষণ দেখিয়াই বলিতেছি। কারণ যে সকল সংস্কার-প্রিয় ব্যক্তি পূর্ব্বে রমণীর উচ্চ শিক্ষার জন্য তুমুল আন্দোলন করিয়াছেন, তাঁহারাই এখন প্রকাশ্য সভা সমিতিতে ও সংবাদ-পত্রে উচ্চ শিক্ষার বিরুদ্ধে কটাক্ষপাত করেন। হয় ত তাঁহারা শিক্ষিতা মহিলাদিগের মধ্যে যে সকল মহদ্ভাব ও সদ্গুণরাশি দেখিবেন বলিয়া আশা করিয়াছিলেন, তাহা দেখিতে পান নাই, সেই জন্যই উচ্চ শিক্ষার বিরোধী হইয়া উঠিতেছেন।

অতএব এই সময় শিক্ষিতা রমণীদিগের আদর্শ ও দায়িত্বের বিষয় উৎকৃষ্টরূপে চিন্তা করা প্রয়োজন; এবং পুরুষেরা উচ্চ শিক্ষা প্রাপ্ত হইয়া যেমন এ দেশের সমাজ, সাহিত্য ও রাজনীতিকে উন্নত করিয়া তুলিয়াছেন, তেমনি রমণীরাও যে উচ্চ শিক্ষা পাইয়া গৃহ ও পরিবারকে উন্নত করিয়া তুলিবেন, তাহার দৃষ্টান্ত দেখান

আবশ্যক। নহিলে কিরূপে স্ত্রীশিক্ষা-বিরোধী কুসংস্কারাচ্ছন্ন লোকদিগের কুসংস্কার দূর হইবে, কিরূপে স্ত্রীশিক্ষার পক্ষপাতী লোকেরাই বা সন্তুষ্ট হইবেন?

শ্রীঅমৃতলাল গুপ্ত।

আদর্শ-রমণী।

(১)

ভকতি-জড়িত রমণী-হৃদয়,
ফিরা'তে মানবে সুপথে সদয়,
রাখিতে ধরমে মানস অটল,
মধুর রমণী-প্রণয়-সম্বল।

(২)

পিরীতি রমণী-হৃদয়ভূষণ,
বিনয়ে রমণী-হৃদয় গঠন,
পীযূষ-পূরিত রমণী-বচন,
স্নেহ-সুধা-ভরা রমণীর মন।

(৩)

সংসারের জ্বালা মানবে যখন
দহে দিবানিশি, দহে অনুক্ষণ,
রমণী-হৃদয় প্রেম-প্রস্রবণ,
সান্ত্বনা ঢালিতে কি আছে এমন!

(৪)

জগতের হিত-কামনা সাধনা,
ভকতি-প্লাবিত ঐশ-উপাসনা,
দয়া সরলতা ক্ষমা ভরা প্রাণ,
পরসুখ তরে আত্ম-বলিদান;

(৫)

জগত-মাঝারে কি আছে এমন?
নাই নাই নাই রমণী মতন।
দুর্লভ সংসারে রমণী রতন,
পর-সুখ তরে রমণী-জীবন।

(৬)

রমণীর প্রাণ অশ্রুজলে গড়া,
রমণীর মন পবিত্রতা-ভরা,
রমণীর বুক শান্তির ফোয়ারা,
রমণীর পুত প্রেম বিশ্ব-যোড়া।

(৭)

জগত-মাঝারে রমণী মতন
স্বার্থ দিতে বলি কে আছে এমন!
পর পদ সেবা আপনা ভুলিয়া
শিখিয়াছে সুধু জনম লভিয়া।

(৮)

দীন বেশে সদা পরম সন্তোষ,
নির্ম্মম আচারে নাহি জাগে রোষ,
পুরুষের হাতে কত ক্লেশ পায়,
তবুও পুরুষে পরাণ বিকায়!

(৯)

পুরুষ-ব্যাভারে অশ্রুজলে ভাসে,
তবুও আনন্দে সেবিছে পুরুষে;
স্বার্থের জগতে কি আছে এমন?
দ্বিতীয় নাহিক রমণী মতন!

(১০)

কর্ম্ম-ক্ষেত্রে নারী প্রধান সহায়,
বীর-বেশে নরে রমণী সাজায়,
জয়লক্ষ্মীরূপা জীবন-সমরে,
পরাজয়ে শান্তি রমণী বিতরে।

(১১)

গার্হস্থ্য আশ্রমে রমণী রতন
অধিষ্ঠাত্রী দেবী কমলা মতন ;
প্রেমের নিঝর, সুখের ফোয়ারা,
শান্তি-নিকেতন, দেবত্বেতে ভরা।

(১২)

পরমেশ-রতি, পরমা সাধনা,
আত্ম-মন দিয়া ব্রহ্ম-উপাসনা,
সকলি রমণী-হৃদয়-ভূষণ,
মুক্তি নরে নারী করে আনয়ন।

(১৩)

দুঃখের সময়ে মানবে হাসাতে,
দয়া ধর্ম্ম নীতি সুকৃতি শিখাতে,
সুখের সংসার করিতে সৃজন,
কেহ নাই আর রমণী মতন।

(১৪)

রমণীর প্রেম বড় মধু-ভরা,
রমণীর স্নেহ শান্তির ফোয়ারা,
রমণী-জীবন প্রেমসুধাময়,
সংসার সংগ্রামে রমণী সহায়।

শ্রীসতীশচন্দ্র রায়।

সাধুবচন-সংগ্রহ।

অন্যের দুঃখের সঙ্গে করিলে তুলনা।
আপন দুঃখের ভারে গুরুত্ব থাকে না।১
পরেতে দেখিয়া দোষ নিন্দিবে যেমন,
সাবধানে ত্যাগ তাহা করিবে তেমন।২
নির্দ্দয় মৃত্যুর বুঝি বধির শ্রবণ,
স্তুতি মিনতির বশ নহে সে কখন।৩
কুচিন্তায় করিও না অন্তর কুটিল,
কুকথায় করিও না রসনা পঙ্কিল। ৪
বিপন্ন জীবন রক্ষা করে যে প্রকারে,
সত্য রক্ষা কর সেই বিধি-অনুসারে।৫
স্বার্থ কুসংস্কারে তত্ত্ব রহে আচ্ছাদিত,
বিচার বিতর্ক তাই নিতান্ত উচিত।৬
কর্ম্মঠতা আছে যার দরিদ্র 'সে' নয়,
শ্রমসহ ঐশ্বর্য্যের তুলনা না হয়।৭
দুঃখ আর দরিদ্রতা অঙ্কুশযুগল,
যত্ন আর পরিশ্রমে রাখিছে সবল।৮
চিকিৎসায় যে রোগের নহে প্রতীকার,
বিদূরিত করে তারে সংযত আহার।৯
মন্দ যার অভিসন্ধি, দুষ্ট যার মন,
তারে ছাড়ি দূরদেশে পলাবে সুজন।১০
দুর্দ্দিনে যাহার তরে অনুতাপ হয়,
করিও না হেন কাজ সৌভাগ্যসময়।১১
যে জন আপন কাজে উপযুক্ত হয়,
এক দিন পুরস্কার পাবে সে নিশ্চয়।১২
প্রভাতে যে কাজ পার রাখিতে সারিয়া,
সায়াহ্নের তরে তাহা দিও না রাখিয়া।১৩
মন্দ পরিহরি ভাল করিবে সদাই,
মানব-কর্ত্তব্য আর ইহা ছাড়া নাই।১৪
মন্দ বলি কাহারেও করিও না ঘৃণা,
সংশোধনে চিত্তশুদ্ধি কাহার ঘটে না?১৫
সকল বিপদ হ'তে প্রাণে বাঁচা যায়,
আপনার হাত হ'তে পলাবে কোথায়?১৬

শরীর মনের স্বাস্থ্য মূলধন যার,
কোন্ দেশে কোন্ কালে কি অভাব
তার ? ১৭
জানিতে বিশ্বের তত্ত্ব ব্যাকুল সবাই,
আপনার তত্ত্ব কিন্তু কারো মনে নাই !১৮
শরীরের রোগে করে সবাই ক্রন্দন,
স্মরিয়া মনের রোগ কাঁদে কয় জন ?১৯
বাহিরের পরিচ্ছদে বড় যত্ন যার,
ভিতর দেখিলে তার উঠিবে হুঙ্কার ।২০
উন্মীলিত চক্ষু রহে গণ্ডীর ভিতরে,
নিমীলিত চক্ষু ছুটে ব্রহ্মাণ্ডের পারে ।২১
না করিলে ইষ্ট দেবে প্রাণ সমর্পণ ।
বালকের খেলা সব সাধন ভজন ॥২২
মশক-দংশনে হয় যে দেহ চঞ্চল,
সে কিন্তু সহিবে দীপ্ত চিতার অনল ।২৩
কি ফল থাকিলে ধন কৃপণের ঘরে,
খনি-স্থিত মণি কার উপকার করে ?২৪
যে মণ্ডূক চিরদিন কূপে করে বাস,
সে কেন বাসিবে ভাল বিমুক্ত বাতাস ?২৫
গলিত দুর্গন্ধে যার তৃপ্তি নিরন্তর,
বাঁচে কি সে কৃমি কভু সেবিলে আতর ?২৬
কি ফল থাকিলে অসি দুর্ব্বলের করে,
দরিদ্রের দয়া লাগে কার উপকারে ?২৭
নিষ্ঠুরের বিদ্যা ধন সকলি অসার,
সিংহ শার্দ্দূলের বলে কার উপকার ?২৮
মূর্খের যতেক দোষ, সবার প্রধান
এই দোষ—নাই তার মূর্খতার জ্ঞান ।২৯
আপন মূর্খতা বোধ জন্মিয়াছে যার,
খুলিয়াছে তার কাছে পাণ্ডিত্যের দ্বার ।৩০
(ক্রমশঃ ।

বিবাহ-ব্যয় ।

আজি কালি উচ্চশ্রেণীর হিন্দু ব্রাহ্মণ কায়স্থ বৈদ্য প্রভৃতির কন্যার বিবাহ একটী মহাসঙ্কট। কয়েক বৎসরের মধ্যে এই সঙ্কট অবস্থা যেরূপ গুরুতর হইয়া দাঁড়াইয়াছে, তাহাতে ভবিষ্যৎ ভাবিয়া নিতান্ত নিরাশ ও ব্যাকুল হইতে হয়।

প্রাচীন হিন্দুশাস্ত্রে "ক্রয়ক্রয়শ্চ মৈথুনং" টাকা দিয়া দাম্পত্য সম্বন্ধ সংঘটন অতি গর্হিত ও পাপজনক কার্য্য বলিয়া নিন্দনীয়। যে পিতা টাকা লইয়া কন্যাকে পাত্রসাৎ করে, সে 'অপত্য-বিক্রয়ী' বলিয়া সমাজের পরিত্যাজ্য। প্রাচীন সমাজে "পাটী-বেচা" এই দুর্নামে সে অভিহিত হইত। বর-পক্ষের ধনগ্রাহী কন্যাপক্ষ এইরূপ নিন্দনীয় ছিলেন।

আশ্চর্য্য, নব্যসমাজ জ্ঞানে সভ্যতায় উন্নত হইয়া এক নূতন অপত্য-বিক্রয় আরম্ভ করিয়াছেন। এখন বিবাহচ্ছলে পুত্রের দর চড়ান হয় এবং কন্যাপক্ষের নিকট হইতে বরপক্ষ যতদূর সাধ্য অর্থ শোষণের চেষ্টা করিয়া থাকেন। ইহা এক বা দুই স্থলে নয়, কিন্তু প্রায় সর্ব্ব-স্থলে একটা প্রথার মত দাঁড়াইয়াছে অথচ ইহা একটা দোষের বিষয় বলিয়া সমাজে

গণ্য হয় না! লজ্জা ও ঘৃণার কথা কি বলা যাইবে, রাজপ্রতিনিধি লর্ড কুর্জন অল্প দিন এ দেশে না আসিতে আসিতে ইহার সন্ধান পান এবং একটী বিশ্ববিদ্যালয়োৎসবে(Convocation) বক্তৃতাকালে ইহার উল্লেখ করেন। এ দেশের বিদ্যার্থী ছাত্রদিগের একটা পাস, ২টা পাস বা ৩টা পাস অনুসারে তাহাদের দর হয় এবং প্রতিযোগিতায় বরের মূল্য স্থির হয়। কায়স্থসমাজে এই বিবাহ-বাণিজ্যের প্রথম সূত্রপাত হয়—পরে ব্রাহ্মণ বৈদ্য নবশাখ এবং নিম্ন হইতে নিম্নতর শ্রেণী সকলের মধ্যেও এই কুপ্রথা প্রচলিত হইয়াছে। এখন ইহার প্রতিষেধ বা দমন করা কাহার সাধ্য?

রাজপুত প্রভৃতি কতকগুলি জাতির মধ্যে বিবাহ-ব্যয় ভয়ঙ্কর আকার ধারণ করিয়া সমাজধ্বংসের সূচনা হইয়াছিল, কিন্তু তাহাদের মধ্যে জাতীয় একতা আছে, তাহারা সকলে মিলিত হইয়া বিবাহব্যয় হ্রাস করিয়াছে এবং রাজা হইতে সামান্য ব্যক্তি পর্যান্ত সমাজ-নির্দ্দিষ্ট নিয়মে বদ্ধ হইয়াছে। ইহাতে তাহাদের সমাজ রক্ষা পাইয়াছে। বরদা মহীশূর প্রভৃতি রাজ্যে হিন্দু রাজা, রাজবিধি দ্বারা তাঁহারা বৈবাহিক কতকগুলি সুনিয়ম সংস্থাপন করিয়াছেন। এইরূপ অন্যান্য প্রদেশে সামাজিক বিভ্রাট নিবারণের উপায় আছে। বঙ্গদেশে এক সময় নাটোররাজ,নবদ্বীপাধিপতি প্রভৃতির ন্যায় প্রতাপশালী জমীদারগণ অথবা ভাটপাড়া, খানাকুল কৃষ্ণনগর প্রভৃতির ন্যায় ব্রাহ্মণ-সমাজ ব্যবস্থাপক হইয়া সমাজ-চালক ছিলেন এবং অনেক কুনিয়ম রহিত করিয়া সুনিয়ম প্রচলনে তাঁহাদের ক্ষমতা ছিল। কিন্তু বর্ত্তমান সময়ে বঙ্গসমাজ নির্মস্তক—না কোনও প্রবল জমীদারের সমাজের উপর তাদৃশ প্রভাব আছে, না কোনও পণ্ডিতসমাজ বিধি-ব্যবস্থা প্রচলনে সমর্থ। বাঙ্গালী জাতি স্বার্থপ্রধান হইয়া যাহার যাহাতে লাভ ও সুবিধা সে তাহারই অনুসরণ করিয়া থাকে, সমাজের মঙ্গলামঙ্গলের প্রতি কাহারও ভ্রূক্ষেপ নাই। এই স্বার্থবুদ্ধি আবার অতি সঙ্কীর্ণ, আপনার আপাত-লাভের মোহে পরিণাম চিন্তা করে না। আমার পুত্র কন্যা আছে, অন্যেরও পুত্র কন্যা আছে। কন্যার জন্য উভয়েই দায়গ্রস্ত। কিন্তু এখন আমার পুত্র দ্বারা লাভবান্ হইবার আশায় বৈবাহিকের সর্ব্বনাশ-সাধনে কুণ্ঠিত নহি। কন্যা-দায় হইতে উদ্ধার হইবার সময় আমাকে আবার বেগ পাইতে হইবে সে চিন্তা নাই। 'আমি দাঁও পাইয়াছি, ছাড়িব কেন? অন্যের গলায় কোপ দিব না ত কি?' এই চিন্তা ও চেষ্টা। 'অন্যের কোপ যে আমার গলায় আবার পড়িবে' সে চিন্তা নাই। স্বার্থান্ধ হইয়া পরস্পরে পরস্পরের উচ্ছেদ সাধনে চেষ্টাপর হইলে সমাজ কি রক্ষা পাইতে পারে? লোকে কন্যাদায়ে সঞ্চিত অর্থ নিঃশেষিত করিতেছে, গৃহসম্পত্তি বন্ধক দিতেছে, ও বিক্রয় করিতেছে, প্রভূত ঋণভারে ভারাক্রান্ত হইয়া নিজে তাহা পরিশোধ

করিতে না পারিয়া পুত্রপৌত্রদিগের স্কন্ধে তাহা চাপাইয়া যাইতেছে। এক একটী কন্যা পার করা বিষম ব্যাপার, যাহার ৬।৭টী কন্যা, তাহার অবস্থা কি শোচনীয়! পিতা মাতা কোথায় অপত্যমুখ দেখিয়া আশা, উৎসাহ ও আনন্দে পূর্ণ হইয়া সংসারধর্ম্ম করিবেন, না কন্যার মুখ দেখিয়া—কন্যার ভাবনা ভাবিয়া তাঁহাদের হৃদয়ের উষ্ণ রক্ত শুকাইয়া যাইতেছে। প্রাচীন শ্লোক আছে :—

"চিতা চিন্তা দ্বয়োর্মধ্যে চিন্তা নাম গরীয়সী।
চিতা দহতি নির্জীবং চিন্তা জীবিতমেব হি॥"

চিতা ও চিন্তা এই দুইটির মধ্যে চিন্তাই অধিক ভয়ঙ্করী। চিতা মৃতকে দাহন করে, কিন্তু চিন্তা জীবন্ত লোককে দাহন করিয়া থাকে।

যে সমাজে অধিকাংশ লোক কন্যাদায়-চিন্তার জীবন্ত দাহনে দগ্ধ হইতেছে, সে সমাজের ধ্বংস অনিবার্য্য, উন্নতি ত স্বপ্ন-প্রলাপ।

বঙ্গসমাজের এইরূপ দুঃসময়ে এক স্থানে একটি আশাকর ঘটনাদর্শনে আমরা অতীব আনন্দিত হইয়াছি। বর্ত্তমান জ্যৈষ্ঠ মাসে জেলা ২৪ পরগণার ডায়মণ্ড হারবরে এক কায়স্থ যুবকের বিবাহ হয়, তাহাতে তাহার পিতা কন্যার পিতার নিকট হইতে এক কপর্দ্দকও লন নাই, কিন্তু তাঁহাকে এই প্রতিজ্ঞায় আবদ্ধ করেন যে, ভবিষ্যতে তাঁহার পুত্রের বিবাহে তিনি কন্যাপক্ষকে কোনও প্রকারে দায়গ্রস্ত করিবেন না—কেবল শাঁখা সাড়ী লইয়া সন্তুষ্ট হইবেন। এই বিবাহক্ষেত্রে স্থানীয় ভদ্রলোক সকলের মিলনে মহাসমারোহ হয় এবং সেই স্থলে দশজন পুত্রবান্ সম্ভ্রান্ত হিন্দু তামা তুলসী হস্তে দণ্ডায়মান হইয়া সর্ব্বসমক্ষে প্রতিজ্ঞা করেন, এই বরকন্যা পক্ষের সাধু দৃষ্টান্তের অনুবর্ত্তী হইয়া তাঁহারাও কার্য্য করিবেন এবং তাঁহাদের পুত্রদিগের বিবাহানুষ্ঠানে তাঁহারাও কন্যা-পক্ষ হইতে এক পয়সা লইবেন না এবং কন্যাকর্ত্তাকে শাঁখা সাড়ী ভিন্ন অধিক ব্যয় করিতে দিবেন না। এই প্রতিজ্ঞানুষ্ঠানকর্ত্তাদিগের সৎ-সাহসকে আমরা ধন্যবাদ করি এবং ঈশ্বরের নিকট প্রার্থনা করি, এই প্রতিজ্ঞানুরূপ কার্য্যানুষ্ঠানে তিনি তাঁহা-দিগের হৃদয়ে বল বিধান করুন্। বঙ্গ-সমাজে এইরূপ সাধু দৃষ্টান্ত স্থানে স্থানে যদি অনুসৃত হয়, তাহা হইলেই এ সমাজের রক্ষা, নতুবা ইহার ভদ্রস্থতা নাই। ত্যাগস্বীকার ভিন্ন কোনও দেশে কোনও কালে কোনও মহা-বিপদ্ নিবারিত বা কোনও মহৎ কার্য্য সাধিত হয় নাই। আমাদের দেশের মঙ্গলাকাঙ্ক্ষী নরনারীগণ এই ত্যাগ-স্বীকারে প্রস্তুত হউন, জাতির মহা-স্বার্থের নিকট আপনার আপনার ক্ষুদ্র স্বার্থকে বলিদান দিতে শিখুন, দেখিবেন জাতীয় উন্নতি আপনা আপনি সুসম্পন্ন হইবে।

গৃহ-চিকিৎসা—মুষ্টিযোগ।

১। এক বাটী শীতল জলে চক্ষু ডুবাইয়া রাখিলে চক্ষুতে ধূলা, বালি বা পোকা পড়িলে ভাল হয়।

২। চক্ষুতে ধূলা, কুটা, কয়লার কুচি, পোকা প্রভৃতি পড়িলে চক্ষুর ঢাকুনি দুটী আড়া আড়ি ধরিয়া পাতায় পাতায় রগড়াইয়া দিলে তৎক্ষণাৎ উপকার হয়।

৩। চক্ষু উঠিলে বড় পানের পাতা লবণের সহিত চট্‌কাইয়া নেকড়ায় ভরিয়া যে দিকের চক্ষু উঠিয়াছে, সেই দিকের কর্ণ ভরিয়া রস দিয়া রৌদ্রে বসিবেক, যখন চক্ষু হিম হইবে, তখন রস ফেলিয়া দিবে। পাতি লেবুর রস দিয়া পাতিলেবুর শিকড় বাটিয়া চক্ষুর নীচে উপর প্রলেপ দিলেও চক্ষুপীড়া ভাল হয়।

৪। গোলাপী আতর রৌদ্রে গরম করিয়া দিলে, শম্বুকাদি তৈল (অর্থাৎ সর্ষপ তৈল অগ্নিতে চড়াইয়া একটা গেঁড়ি শম্বুক তাহাতে ভাজিয়া লইয়া সেই তৈল) দিলে কাণ পাকা ভাল হয়।

৫। রাত্রিতে শয়নকালে পানের রস পায়ের তলায় ডলিবেক, তাহা হইলে মাথার উকুন ভাল হইবে।

৬। দাদ্রুরাজ বা বনপালঙ্গের পাতা লবণের সহিত রগড়িয়া ঘুঁটের দ্বারা চুলকাইয়া ঐ রস দিলে দদ্রু বা দাদ আরাম হয়।

৭। গজপিপ্পলী গাছের ছাল বাটিয়া গরম করিয়া প্রলেপ দিলে গোদ ভাল হয়। রাত্রিতে প্রলেপ বাঁধিয়া রাখিবে, ৪।৫ দিন দিলে সারিবে।

৮। হরিতাল, বয়ড়া, বৃহতীর মূল তিন সমভাগে লইয়া মধু দিয়া মাড়িয়া লেপ দিলে মাথার টাক ভাল হয়।

৯। রাঙা শাকের পাতা মুখে চিবাইয়া ঘা মুখে দিলে, কিম্বা ছাগলের নাদি কাঁচা হইলে ঘসিয়া, অথবা শুষ্ক হইলে জলে গুলিয়া দিলে কিম্বা গাওয়া ঘৃত গলাইয়া সৈন্ধব লবণ মিলাইয়া ঘা মুখে দিলে বিছা কামড়ান বা আসাপার বিষ লাগিলে ভাল হয়।

১০। ভাতের ফেন লবণ মিশাইয়া মাখিলে গায়ের পোকা যায়।

১১। ৫।৭টা গোল মরিচ গুঁড়া করিয়া মিছরীর জলের সহিত খাইলে তখনি পেট ফাঁপা ভাল হয়। বাতাসার সরবত করিয়া খাইলেও আশু উপকার দর্শে।

১২। পুরাণ তেঁতুলের মজ্জা মাখিয়া শুকাইয়া গেলে মলিয়া ফেলিলে অথবা ঐ মজ্জা সরিষা তৈলের সহিত মিশাইয়া গাত্রে মাখিলে চুলকোণা, ও গায় দাগড়া দাগড়া হইলে তাহা ভাল হয়। চাল মুগরার ফল হরিদ্রার সহিত বাটিয়া গাত্রে মাখিলে ৩।৪ দিনে চুলকোণা ভাল হয়।

১৩। চলন্ত ষাঁড়ের গোবর আনিয়া বড় হাঁড়ায় জল দিয়া গুলিয়া ভরিয়া

বকযন্ত্র বানাইয়া বড় চুলায় জ্বাল দিয়া আরক বাহির করিয়া সকল শরীরে ভাল মতে,মাখাইয়া দিলে সর্ব্বপ্রকার কুষ্ঠ—গলিত কুষ্ঠও ভাল হয়।

১৪। আকন্দর আটা ও লবণ সমভাগে একত্র করিয়া শুকাইয়া দন্তধাবন করিলে দন্তের পীড়া ভাল হয়।

১৫। মাধবীলতা ফুলের গাছের শিকড় বাটিয়া কিঞ্চিৎ মুখামৃত দিয়া প্রলেপ দিলে গরল ভাল হয়।

১৬। গরুর কাঁচা দুধের গাঁজা চিনি মিশাইয়া টাক পড়া জায়গায় ৫।৭ দিন দিলে স্ত্রীলোকের টাক মাথায় চুল হয়।

১৭। ডাকপাখীর মাংস গোলমরিচের সহিত ঝোল রাঁধিয়া ৩ দিন খাইলে সূতিকা রোগ ভাল হয় অথবা মাগুর কি কৈ মাছ ধনের বাটনা দিয়া পাক করিবে এবং পূতিকার শিকড় তোলাখানেক বাটিয়া ঐ ধনিয়ার বাটনার সঙ্গে দিয়া ঝোল রাঁধিয়া খাওয়াইবেক। যখন খাইতে খাইতে তিত লাগিবে তখন সূতিকা ভাল হইয়া যাইবে।

১৮। তুঁতে পোড়াইয়া হীরাকস সহ সমভাগে মিশাইয়া দন্তে দিলে নড়া দন্ত শক্ত হয়।

১৯। তালগাড়া অর্থাৎ কচি তালের ডগা ছেঁচিয়া আগুনে ঝলসাইয়া তাহার রস গরম জলে দিয়া কুলী করিলে সর্ব্বপ্রকার দন্তরোগ ভাল হয়।

২০। ১ তোলা কর্পূর পাথরবাটীতে রাখিয়া মহিষের সিং দিয়া দুই দণ্ড নাড়িয়া পরে ঐ কর্পূর উন্মাদ পাগলের মাথায় ২ দণ্ডকাল মলিবেক, তখনি ঐ পাগলের নিদ্রা আসিবেক—উন্মাদ রোগ ক্রমে ভাল হইবেক।

২১। কোনও স্থান কাটিয়া গেলে গাঁদা পাতার রস তৎক্ষণাৎ তাহাতে দিয়া এই পাতা ছেঁচিয়া বাঁধিয়া দিলে রক্ত বন্ধ হইবে, ব্যথা থাকিবে না এবং কাটা ঘা বেশ যোড়া লাগিবে।

শোক-গাথা।*

জগতের এক কোণে, নীরবে নিশ্চিন্ত মনে,
কষ্টের অর্জ্জিত অন্ন সুখে ভোগ করিত;
অতৃপ্ত ধনের আশা করেনি হৃদয়ে বাসা,
অক্ষুণ্ণ শান্তির সহ সদা কাল হরিত;
কাপট্য কাহাকে বলে জানিত না কোন কালে,
স্বার্থ সিদ্ধি-কর বাক্য কভু নাহি বলিত;
আত্মপর জ্ঞান লয়ে ছিল না উন্মত্ত হয়ে,
যোগ্য জনে যোগ্য ভাবে সমাদর করিত;
লক্ষ্যশূন্য জ্ঞানহীন হয় নাক কোন দিন,
উন্মত্ত স্রোতের বেগে অঙ্গ ঢালি দেয়নি;
নিজের সামর্থ্য মত পরহিতে ছিল রত,
বচন বিলায়ে কভু বড় হ'তে চায় নি।
কপর্দ্দক দান করে ঢক্কা যোগে উচ্চৈঃস্বরে

* বামাবোধিনীর সহকারী কার্য্যাধ্যক্ষ ও সিটি কলেজিয়েট স্কুলের অন্যতম শিক্ষক পরলোকগত-বন্ধুবর আশুতোষ ঘোষের বিয়োগ উপলক্ষে লিখিত। মৃত্যু-তারিখ ১৭ই বৈশাখ, ১৩১০ সাল।

আপন দাতৃত্ব কভু সুপ্রচার করেনি,
রোগীর শুশ্রূষা করি বলে নাই দম্ভ করি
আমি যাহা করিয়াছি আর কেহ পারেনি;
মিষ্টভাষী সদাচারী, বন্ধুজন-মনোহারী
মুরতি তাহার বড় ছিল মধুময় রে!
নিরদয় কাল হায়! কেনরে হরিলি তায়?
এ জগৎ আর কিরে তার যোগ্য নয় রে!

২

স্বার্থপর নীচাশয় হেথাকার লোকচয়
তাই বুঝি দয়াময় তারে টেনে নিয়েছে?
সদানন্দ সেই ধাম অমরা যাহার নাম
ধার্ম্মিকের আত্মা যথা নিরন্তর রয়েছে;
যথা হিংসা অভিমান পারে না লভিতে স্থান
কামনা বাসনা যথা নিরবাণ পেয়েছে;
নিরপেক্ষ সুবিচার উপযুক্ত পুরস্কার
সকলের তরে যথা সর্ব্বক্ষণ রয়েছে।

৩

আশুতোষ! যাও ভাই যথায় কলুষ নাই—
চিরশান্তিনিকেতন শান্তিময় সদনে।
অহঙ্কারে সদা রত এ ধরার লোক যত
তব যোগ্য পুরস্কার প্রদানিবে কেমনে?
যেমন সামর্থ্য তব দিয়াছিলা ভবধব,
তার যোগ্য ব্যবহার করিয়াছ যতনে,
পঞ্চযজ্ঞ আচরণে ছিলে রত অনুক্ষণে,
ক্ষুদ্র আয় তবু দুঃখ নাহি ছিল জীবনে।

(৪)

তব-গত-প্রাণা যিনি তোমার সে প্রণয়িনী
তোমার স্নেহের ধন পুত্র কন্যা সকলে,
হারায়ে তোমারে তারা হইয়াছে দিশাহারা
বরষিছে অশ্রুধারা অবিরল বিরলে।
শূন্যতোয় সরোবরে যেন মীন প্রাণ ধরে
অথবা আশ্রয়তরু-পরিচ্যুতা ব্রততী,
তব ধর্ম্মপত্নী হায়! নিরাশ্রয় নিরাশায়
কাটায় ব্যথিতপ্রাণে দিবানিশি তেমতি।

৫

থাকিয়া অমরলোকে রেখো সবে চোকে চোকে
যেন তারা সত্যপথ-ভ্রষ্ট নাহি হয় হে,
পরমেশ-প্রেমে মন যেন থাকে অনুক্ষণ
মলিন বাসনা যেন হৃদয়ে না রয় হে;
সংসারের কষাঘাত নাহি করি দৃষ্টিপাত
কর্ত্তব্যপালনে যেন সদা মতি রয় হে;
জীবন ফুরাবে যবে তব প্রণয়িনী তবে
যেন তব অঙ্কশায়ী অমরায় হয় হে।

শ্রীমন্মথনাথ সিংহ।

ঈশ্বরের নামাবলী।

ম।

মঙ্গল, মঙ্গলকারী, মঙ্গলদাতা, মঙ্গলনিদান, মঙ্গলনিধান, মঙ্গলময়, মঙ্গলালয়, মঙ্গল্য, মঞ্জু, মঞ্জুল, মঞ্জুক, মদনমোহন, মণি, মণ্ডলেশ, মতিমান্, মৎসরহীন, মধু,

মধুর, মধুরতম, মধুসূদন*, মধ্যবর্ত্তী, মধ্যস্থ, মনের মন, মনস্কামপূরক, মনস্তাপ-হর, মনস্বী, মনীষী, মনোজব, মনোরম, মনোহর, মনোরঞ্জন, মন্তব্য, মন্তা, মন্ত্রের স্বরূপ, মন্ত্রবিৎ, মরণহরণ, মরণহীন, মর-ণান্তক, মর্ম্মজ্ঞ, মর্ম্মবিদ্, মর্ম্মবেদী, মর্ম্ম-ব্যথানাশন, মর্য্যাদাবান্, মর্ষিত, মলিনতা-হারী, মহৎ, মহতোমহীয়ান্, মহনীয়, মহা-কাল, মহাতেজা, মহাত্মা, মহাদেব, মহা-ধন, মহানুভব, মহাপাতকনাশন, মহা-পাপীর উদ্ধারকর্ত্তা, মহাপুরুষ, মহাপ্রভু, মহাপ্রলয়কারী, মহাপ্রাণ, মহাবল, মহা-মহিম, মহারাজাধিরাজ, মহার্ঘ্য, মহালয়, মহাবীর্য্য, মহাশক্তি, মহাশয়, মহিমান্বিত, মহিমালয়, মহিমাপূর্ণ, মহেশ, মহেশ্বর, মহৈশ্বর্য্যশালী, মালিক, মা, মাতা মাতা-পিতা, মাতৃকা, মাধব, মাধুর্য্যময়, মাননীয়, মায়াতীত, মায়াবী, মালিক, মাহাত্ম্যপূর্ণ, মিতা, মিত্র, মিথ্যাতীত, মিলনভূমি, মিষ্ট, মীমাংসক, মুকুন্দ, মুক্ত, মুক্তিদাতা, মুক্তির সোপান, মুখ, মুখ্য, মুগ্ধকারী, মুনি, মুমুক্ষু-শরণ, মূল, মূলাধার, মৃতসঞ্জীবন, মৃত্যুঞ্জয়, মৃত্যুনাশক, মৃহৃ, মৃদুল, মেলক, মোক্ষ-দাতা, মোহন্ন, মোহন, মৌনী, ম্লেচ্ছার্য্য-সমদর্শী।

* ভক্তানাং কর্ম্মণাঞ্চৈব সূদনং মধুসূদনং।
পরিণামাশুভং কর্ম্ম ভ্রান্তানাং মধুরং মধু।
করোতি সদনং যোহি স এব মধুসূদনঃ॥

একটু পূর্ব্বস্মৃতি।

(কোনও সম্ভ্রান্ত মহিলা লিখিত।)

ঠিক ৫ বৎসর গত হইল, শ্রদ্ধেয়া কৈলাস-কামিনী দেবী এ শোকপূর্ণ নরধাম পরি-ত্যাগপূর্ব্বক সেই শান্তিপূর্ণ অমরধামে মহেশের চরণপ্রান্তে আশ্রয় লইয়াছেন। পৃথিবীর এতগুলি স্নেহবন্ধনও ঈশ্বরের প্রিয়কন্যা সেই সাধ্বীকে সংসারে বাঁধিয়া রাখিতে সমর্থ হইল না। কৈলাস-কামিনীর অকালে ইহলোক-ত্যাগের সংবাদ অনেকের হৃদয় আহত করিয়াছে —অনেক চক্ষু অশ্রুপ্লাবিত করাইয়াছে। আমি স্বর্গগতা ভগ্নীর সহিত গত সুদীর্ঘ ৩১ বৎসর গভীর প্রণয়সূত্রে গ্রথিত ছিলাম। ধর্ম্মসমাজে ও কার্য্য-ক্ষেত্রে একত্র কার্য্য করিয়াছি,* এক দিনের জন্যও কোনও বিষয়ে মতান্তর হয় নাই, প্রত্যুতঃ তাঁহার চরিত্রের মধুরতায় মুগ্ধ হইয়া শ্রদ্ধা ও প্রীতির সহিত সামাজিক ও ধর্ম্ম বিষয়ে একপ্রাণে যোগরক্ষাপূর্ব্বক নিজকে ধন্য মনে করিয়াছি। আজি সেই পুণ্যবতী সতীর অভাবে সুখের সংসার শ্রীহীন। পতি ও সন্তানগণের হৃদয় গভীর শোকান্ধকারে পূর্ণ। কৈলাসকামিনী দেবীর অতুলনীয় ধৈর্য্য, পতিভক্তি, ধর্ম্ম-

*ইনি দক্ষতার সহিত "বঙ্গ মহিলা" সমাজের সম্পাদিকার কার্য্য নির্ব্বাহ করেন।

নিষ্ঠা, পরিশ্রমশীলতা, মিতব্যয়িতা প্রভৃতি সদ্গুণ প্রত্যেক মহিলার অনুকরণীয়।

ইঁহার স্বামী মহাশয় যে সংসারে বাস করিয়াও সংসারে নির্লিপ্তভাবে জীবন যাপন করিয়া আসিতেছেন, সকলেই এ কথা অবগত আছেন। কৈলাসকামিনী নিশিদিন অতি পরিশ্রমে ও বিচক্ষণ রাজনীতিজ্ঞের ন্যায় সামান্য আয়ে সকল প্রকার ভদ্রতা রক্ষা—স্বামী ও সন্তানগণের সুখস্বাচ্ছন্দ্যের উৎকৃষ্ট ব্যবস্থা স্থাপনপূর্ব্বক সুন্দর বাটী প্রতিষ্ঠিত এবং স্বামীকে ঋণমুক্ত করিয়া স্বর্গারোহণ করিয়াছেন। ইনি স্বামীকে সংসারের কোনও বিষয়ের জন্য কদাচ উত্ত্যক্ত করা দূরে থাকুক, তাঁহাকে ধর্ম্মানুষ্ঠানের জন্য সর্ব্বতোভাবে নির্লিপ্ত থাকিবার যেরূপ সুবিধা করিয়া দিয়াছিলেন, আমাদের সমাজের কোনও মহিলাই এ পর্য্যন্ত সেরূপ পারেন নাই। গৃহে আগমন করিলে পরিবারের গোলমালে কার্য্যক্ষতি হইবে মনে করিয়া তিনি পতি মহাশয়ের রাত্রিকালীন আহারীয়ও পরম যত্নে একটী পিতলের কৌটায় আবদ্ধ করিয়া তাঁহার কার্য্যালয়ে প্রেরণ করিতেন। সংসারের গুরুতর ভার বহন করিলেও কদাচ তাঁহার মুখমণ্ডলে অপ্রসন্নভাব দৃষ্ট হয় নাই। তাঁহার মনোহর সরল প্রকৃতির আভাস কোন্ কথায় দিব জানি না। ৫ মিনিটের জন্য সাক্ষাৎ হইলেও হৃদয়দ্বার অবারিতভাবে উদ্ঘাটন করিয়া দিতেন। ধর্ম্মসমাজ, সামাজিক বিষয়, স্বামী সংসার কোনও বিষয়ে অণুমাত্র গোপন করিয়া আলাপ করিতেন না। তাঁহার মধুর ব্যবহারে প্রতিবাসী, ভৃত্যাদি সকলেই একান্ত অনুরক্ত ছিল। মিষ্ট ব্যবহারে সকলকেই পরিতুষ্ট রাখিতেন। এত পরিশ্রমেও তাঁহার ক্লান্তিবোধ ছিল না।" বামাবোধিনী পত্রিকা'র হিসাব, টাকা আদায় প্রভৃতিও একাই বহুদিন পর্য্যন্ত সুচারুরূপে নির্ব্বাহ করিয়াছেন। এত কঠোর পরিশ্রম অক্লান্ত প্রফুল্লভাবে আজীবন করিয়া প্রকৃত সাধ্বী রমণীর জীবনের যে পবিত্রতাপূর্ণ উজ্জ্বল আদর্শ পৃথিবীতে রাখিয়া গিয়াছেন, প্রত্যেক ভারত-মহিলা তাহা অনুকরণ করিয়া ধন্য হইবেন।

বিবিধ তত্ত্ব।

বিবাহের যৌতুক।

১। শ্যামদেশে নিমন্ত্রিত ব্যক্তি মাত্রকেই কিছু কিছু উপঢৌকন আনিতে হয়।

২। আর্ম্মেণীয়ান্‌দের বিবাহের পূর্ব্বরাত্রে বরকন্যা পরস্পর যৌতুক বিনিময় করে।

৩। সুইডেনের কন্যারা বন্ধুদের

নিকট হইতে শূকর, ভেড়া ও গরু এবং বরের নিকট হইতে টাট্টু ঘোড়া, কুকুর, বিড়াল এবং রাজহংসী উপঢৌকন পায়।

৪ টার্কম্যান, মুর এবং পূর্ব্বাঞ্চলবাসী অনেক জাতি বরের কপালে টাকা বাঁধাইয়া দেয়।

৫। নরওয়ে দেশে প্রত্যেক নিমন্ত্রিত-ব্যক্তি কন্যার জন্য এক এক ভাঁড় মাখম আনিত, শীতকালে বিবাহ হইলে লবণাক্ত বা বরফ-মিশ্রিত মাংস উপহার দিত।

৬। বর্ত্তমান আরবদিগের মধ্যে বিবাহের ২১ দিন পূর্ব্বে বর কন্যার জন্য উপঢৌকন সকল পাঠাইয়া দেয়। কন্যা যখন বরের গৃহে পৌছে, গৃহসামগ্রী, একটি তাঁবু ও একটি বল্লম উপহার দেয়।

৭। পারস্যে বরকে অন্যান্য উপহারের সহিত কিছু টাকা পাঠাইতে হয়। যদি তাহার অবস্থা মধ্যবিধ হয়, কন্যাকে দু স্যুট পোষাক, একটি অঙ্গুরীয় ও একখানি আর্‌সি দেয়। তদ্ভিন্ন গৃহের প্রয়োজনীয় তৈজস পত্র সমূহ প্রভৃতি তাহাকে দিতে হয়।

৮। চীনদেশে বিবাহের কিছুদিন পূর্ব্বে বরের পরিজনবর্গ কন্যার পরিজনদিগকে খাদ্য, একটি মোরগ ও মুরগী, শূকরের পা, ছাগলের পা, ৮ খানি রুটি, ৮টি মশাল এবং ৩ যোড়া বড় লাল বাতী পাঠাইয়া দেয়।

মুদ্রা বিনিময়।

নরওয়েবাসীরা এখনও মুদ্রার পরিবর্ত্তে শস্য ব্যবহার করে।

জন্তুর চামড়া সর্ব্বপ্রথম মুদ্রাকারে ব্যবহৃত হইত।

চীনে রেসম মুদ্রাস্থানীয়।

প্রাচীন রোমানেরা ভেড়া এবং বলদ টাকার পরিবর্ত্তে ব্যবহার করিত।

জুলু এবং কাফ্রিদের মধ্যে বলদ মুদ্রার বদলে ব্যবহৃত হয়।

নিজনি নভোগরোডের মেলাতে বড় বড় দস্তা খণ্ড মুদ্রাস্থানীয়।

নিউগিনীর মফঃস্বলে স্ত্রীদাসেরা মুদ্রাস্থানীয়।

অষ্ট্রেলিয়ার কোন কোন আদিমনিবাসীদের মধ্যে হরিৎ এবং রক্ত প্রস্তর মুদ্রারূপে ব্যবহৃত হয়। দক্ষিণ আমেরিকার মফঃস্বল প্রদেশে নারিকেল ও ডিম্ব, ও চকোলেট মুদ্রাস্থানীয়।

মধ্য আফ্রিকার কোন কোন স্থানে ছুরী এবং লোহা বা পিতলের দণ্ড প্রভৃতি মুদ্রারূপে ব্যবহৃত হয়।

আডাম স্মিথ বলেন,—অধিক দিন নয় স্কটেরা নখ মুদ্রারূপে ব্যবহার করিত।

ফিজি দ্বীপে তিমির দন্ত, দক্ষিণ সমুদ্রের দ্বীপ সকলে লাল পালক এবং আবিসিনিয়াতে লবণ মুদ্রাস্থানীয়।

আইসলণ্ড এবং আয়র্লণ্ডের আইন সকল পাঠে জানা যায় যে, তাহারা গো মেষাদি মুদ্রারূপে ব্যবহার করিত।

১৬৫২ খৃষ্টাব্দে ইংরাজেরা আমেরিকায়

যখন উপনিবেশ স্থাপন করেন, তখন তামাক, শস্ত, ছোলা, কড মৎস্য এবং মৃগনাভি মুদ্রার পরিবর্ত্তে ব্যবহৃত হইত।

ভারতবর্ষ, ভারতবর্ষীয় দ্বীপসমূহ এবং আফ্রিকাতে কড়ি মুদ্রার পরিবর্ত্তে প্রচলিত আছে।

ফ্রান্সরাজ জন দি গুড ১২৬০ সালে মুদ্রার পরিবর্ত্তে লেদার ব্যবহার করেন।

ব্রিটীষ ওয়েষ্ট ইণ্ডিজ দ্বীপে আলপিন, রুটির টুকরা অথবা এক চামচে নস্ত দিয়া জিনিষ কেনা যায়।

আফ্রিকার সমুদ্রতীরে কুড়ালী মুদ্রারূপে প্রচলিত।

শরীরের আশ্চর্য্য গঠন।

শরীরের চামড়াতে ২০০০০০০ লক্ষ ছিদ্র আছে। প্রত্যেকের সহিত এক একটী ঘর্ম্মস্থলী সংযুক্ত। মনুষ্যের কঙ্কাল বা অস্থিময় দেহ ২০০ শত পৃথক্ অস্থি দ্বারা নির্ম্মিত। মনুষ্যের শরীরে যত রক্ত আছে, সমুদয়ই ১ মিনিটে হৃৎস্থলী দিয়া চলিয়া যায়। শ্বাসযন্ত্রের বিস্তার ৩২০ ঘন বুরুল। সাধারণ শ্বাসক্রিয়ায় প্রত্যেক শ্বাসে এক পাইণ্ট বায়ু গৃহীত ও পরিত্যক্ত হয়। পাকস্থলী আহার পরিপাকের জন্য প্রতিদিন ৯ পাউণ্ড জারক রস প্রস্তুত করে; ইহা ৫ পাউণ্ড পর্য্যন্ত রস ধারণ করিতে পারে। শরীরে ৫০০ শতের অধিক মাংসপেশী, ধমনী এবং শিরা আছে। হৃৎপিণ্ডের ওজন ৮ হইতে ১২ আউন্স, ইহা ২৪ ঘণ্টায় লক্ষবার চলে। মানুষ প্রতিদিন গড়ে ৫।।০ পাউণ্ড অন্ন ও পানীয় গ্রহণ করে। মানুষ প্রতি মিনিটে ১৮ বার নিশ্বাস প্রশ্বাস ফেলে।

গৃহকার্য্য।

মিষ্টান্নাদি পাক।

সুজির বরফী—উনুন জ্বালিয়া /০ এক ছটাক ঘৃত কড়ায় দিয়া তাহাতে ৵।।০ আধ সের সুজি ঢালিয়া দিবে। যখন সুজির ভাজা গন্ধ বাহির হইবে, তখন তাহা অন্য পাত্রে ঢালিবে। পরে কড়ায় গজার রসের ন্যায় চিনির রস গাঢ় করিয়া তাহাতে ভাজা সুজিগুলি ঢালিয়া দিবে। পরে তাহার উপর আধ পোয়া বা তিন ছটাক শুষ্ক ক্ষীর ছড়াইয়া দিবে এবং বাদাম পেস্তা ও কিসমিস দিবে। ক্ষীরগুলি সমস্ত কড়াতে নাড়িয়া মিশ্রিত করিবে। পরে একখানি পাথরে ঘি মাখাইয়া পাককরা জিনিষ ঢালিবে এবং খুন্তী দ্বারা সমভাবে প্রশস্ত করিয়া লইবে। তার পর হাতে ঘি মাখাইয়া খুন্তী দ্বারা বাদামে ভাবে বরফীর ন্যায় কাটিবে। ইহাতে জল নাই, ইহা খাইতে অতি সুস্বাদু।

আঁবের বড়া—খুব উত্তম আঁব

নিংড়াইয়া গাঢ় মাড়ি বা রস বাহির করিবে। সেই মাড়িতে অল্প পরিমাণ ময়দা ও শুষ্ক ক্ষীর মিশাইবে। পরে ফুলারীর মত ঘিয়ে ফেলিয়া ভাজিবে। যখন আশুলার গায়ের মত রঙ্ হইবে, তখন চিনির রসে ফেলিবে। সকালে তৈয়ার করিয়া বৈকালে খাওয়া যায়। পেঁপের বড়াও এইরূপে তৈয়ার হয়।

আলুর বোমা বা বড়া—এক সের আলু সিদ্ধ করিয়া লঙ্কার কুচি ও লুণ দিয়া এমন করিয়া চট্‌কাইবে, যে ভিতরে একটু শক্ত অংশ না থাকে। পরে সেই চট্‌কান আলু গোল গোল করিয়া পাকাইয়া বাটা মটর ডালে ডুবাইয়া ডুবাইয়া কড়ায় তৈয়ারী তেলে ভাজিবে। ইহা খাইতে বেশ।

আলুর আচার—প্রথমতঃ ⁄২॥০ শরিষার তেলে আধপোয়া লঙ্কাবাটা ফেলিয়া ও আধ পোয়া পাঁচফোড়ন দিয়া চারি পাঁচ দিন রৌদ্রে দিবে। তৎপরে আলু জলে সিদ্ধ করিয়া খোসা ছাড়াইবে, পাথরের পাত্রে কিম্বা বারকোসে ঢালিয়া একছটাক হলুদ ও আধছটাক লঙ্কাবাটা, এক পোয়া কিম্বা দেড় পোয়া লবণ ও আধ সের তেঁতুলের মাড়ি মাখাইয়া দুই তিন দিন রৌদ্রে দিয়া যখন সমস্ত মসলা-গুলি আলুর গায়ে শুখাইয়া যাইবে, তখন উপরি-উক্ত তৈলে ফেলিবে এবং উহা দুই তিন দিন রৌদ্রে দিয়া তুলিয়া রাখিবে।

কচুভাজা—ভুঁই কচুর পাতা ডাঁটা পশ্চিমে লোকেরা খায় ও এটা অরুচির রুচিকর, খেতে খুব ভাল লাগে। কচি কচি পাতা নিয়ে বেশ ক'রে ধুইয়া পুঁছিয়া লইবে ও মটরডাল ভিজাইয়া তাহাতে বেস ভালক'রে চলনসই আন্দাজমত লবণ দিয়া তাহার সঙ্গে ২।৪টা লঙ্কা বাটিবে। তাহার পর বেশক'রে চট্‌কাইয়া লইবে, তাহার পর প্রত্যেক পাতায় ডাল-বাটা বেশক'রে মাখাইবে, আবার তাহার উপর আর একটী পাতা দিবে, ফের ঐ রকম ক'রে ডালবাটা মাখাইবে। এই রকম ক'রে ৩।৪টী পাতাতে মাখাইবে। তাহার পর ১টী ২টী ৩টী ৪টী উপরে উপরে রাখিয়া বাণ্ডিলের সূতা দিয়ে সমস্তটা বেশ করে বাঁধিবে। যে রকম করে ভাপা পুলি করে, সেই রকম করে ভাপাইয়া লইবে। সুসিদ্ধ হইলে পর চাকা চাকা করিয়া ঘিয়ে ভাজিলে খুব ভাল হয়। তেলেও ভাজা যায়। কিন্তু বেশ লাল করিয়া ভাজিবে। মুখ-রোচক এটা খুব।

বিজ্ঞান রহস্য।

১। চিজল বা শিলাতরু।

আমেরিকার অন্তঃপাতী মেক্সিকো-প্রদেশে একজাতীয় আশ্চর্য্য বৃক্ষ দৃষ্ট হয়। তত্রত্য লোকেরা ইহাকে চিজল (Chijol)

বলিয়া থাকে। ইহার গুণ অতীব চমৎকার। কাষ্ঠ দেখিতে অতি সুন্দর এবং কাঁচা অবস্থায় বা সদ্য কাটিয়া তাহাতে নানাপ্রকার গঠন করা যাইতে পারে। বৃক্ষ কাটিয়া ফেলিয়া রাখিলে ক্রমে ক্রমে কঠিন হইয়া উঠে এবং কিছুকাল পরেই পাষাণত্ব প্রাপ্ত হয়। তখন আর ইহাকে সহজে ছেদন করা যায় না, পাষাণের ন্যায় ইহা দৃঢ় ও দুর্ভেদ্য হয়। কাষ্ঠ ভূমির উপর পতিত থাকুক অথবা ভূ-নিম্নে প্রোথিত থাকুক, সকল স্থানে সকল অবস্থাতেই পাষাণত্ব প্রাপ্ত হয়। ইহার কাষ্ঠে গৃহাদি প্রস্তুত করিলে তাহা দেখিতে সুন্দর হয় এবং কয়েক বৎসরের মধ্যে পাষাণবৎ দৃঢ় ও অগ্নিসহ হইয়া থাকে। ইহা সহজে ভগ্ন হয় না এবং বহুকাল স্থায়ী হয়। কাষ্ঠ পাষাণত্ব প্রাপ্ত হইলে ইহার স্বাভাবিক বর্ণের পরিবর্ত্তন হয় না, সুন্দর ত্বক্ চিরকাল অবিকৃত থাকে। একটী বৈজ্ঞানিক পণ্ডিত ইহার এই অদ্ভুত গুণ বর্ণনা করিয়া মন্তব্য প্রকাশ করিয়াছেন যে, এই কাষ্ঠ বহুলরূপে ব্যবহৃত হইলে প্রস্তর ব্যবসায়ে বিষম বিপ্লব উৎপন্ন করিবে।

২। মাংসাশী বৃক্ষ।

"মাছিধরা", "কীটগ্রাহী" প্রভৃতি বৃক্ষের কথা অনেকেই অবগত আছেন। পতঙ্গ ধৃত করিয়া পত্র বদ্ধ করত তাহা জীর্ণ করা, ইহাও অনেকে জানেন। কিন্তু পত্র মধ্যে মাংসখণ্ড নিক্ষেপ করিলে, ক্ষণকালের মধ্যে তাহা জীর্ণ হইয়া বৃক্ষ-শরীরে রসধারারূপে প্রবাহিত হওয়া অতীব বিস্ময়াবহ। এই নবাবিষ্কৃত বৃক্ষের পাতা সকল ডবল এবং চোঙ্গার ন্যায় গঠিত। তিনভাগ যোড়া এবং বোঁটার দিকে একভাগ খোলা থাকে। ইহা স্বভাববশতঃ (যেন ইচ্ছামত) এই খোলা বা অনাবৃত অংশ মুখের ন্যায় বিস্তৃত ও বন্ধ করিয়া থাকে। মুখের গঠন শম্বুকের ন্যায়—বন্ধ হইবার সময় আঁটিয়া বসিয়া যায়। পত্রের অভ্যন্তরে কণ্ঠনালীর ন্যায় রন্ধ্র দৃষ্ট হয়, ইহার চতুর্দ্দিকে সূক্ষ্ম সূক্ষ্ম কেশরাজী বিন্যস্ত আছে এবং প্রত্যেক কেশের প্রান্তদেশ আটাবৎ পদার্থে জড়িত। যখন পত্র অনাবৃত অংশ বিস্তার করিয়া থাকে, তখন তন্মধ্যে কীটপতঙ্গাদি পতিত হইলে তৎক্ষণাৎ বদ্ধ হয় এবং ক্ষণমধ্যে তাহা জীর্ণ হইয়া রসাংশ কণ্ঠনালী-যোগে বৃক্ষশরীরে প্রবাহিত হইয়া তাহার পুষ্টি সাধন করিয়া থাকে। কণ্ঠনালীস্থ কেশ-প্রান্তের আটাবৎ পদার্থ জন্তুশরীরের জারক রসের (gastric juice) ন্যায় শীঘ্রই খাদ্য বা আহৃত দ্রব্য জীর্ণ করিয়া ফেলে। এই পত্রমধ্যে ক্ষুদ্র ক্ষুদ্র মাংসখণ্ড, মৎস্য, ও ডিম নিক্ষেপ করিয়া দৃষ্ট হইয়াছে যে, ইহা সহজে তাহা জীর্ণ করিয়াছে; কিন্তু আটাযুক্ত ও বশা বা বশাবৎ পদার্থ পত্রমধ্যে নিক্ষেপ করিলে পত্র বন্ধ হয় না এবং তাহা জীর্ণও হয় না। কিছুদিন এইরূপ উন্মুক্তভাবে থাকিয়া পত্র বিবর্ণ হয় ও খসিয়া পড়ে।

কাব্যবোধ।

(৪২৪ সংখ্যা—৩২ পৃষ্ঠার পর।)

ছন্দপ্রকরণ।

দ্বাদশাক্ষরাবৃত্তি। জগতী। ১

ইহা মণিমালা ছন্দের অনুরূপ। ষষ্ঠ ও দ্বাদশ বর্ণে যতি। যথা,

নাহি জাতিগত সার্ব্বভৌম মত,
না আছে একতা শক্তি জাতিগত!
গৃহ বিচ্ছেদেতে অধঃপাতে যায়,
স্ব-দেশের হিত ক-জন বা চায়?

তোটক। সংস্কৃত ছন্দ। ২

ভারতচন্দ্রের অনুকরণ করিয়া অনেকে ইহা বাঙ্গালা কাব্যে ব্যবহৃত করিতেছেন। ইহার তৃতীয়, ষষ্ঠ, নবম ও দ্বাদশ গুরু, অবশিষ্ট বর্ণগুলি লঘু। যথা,

মলয়া পবনে ঘন মন্দ বহে,
মম জীবন যেমন দাবদহে।

অথবা, দ্বিজ ভারত তোটক ছন্দ ভণে।
কবিরাজ কহে যত গৌড় জনে॥

ভুজঙ্গ প্রয়াত। ৩। ইহাও সংস্কৃত ছন্দ। অনেকটা তোটকের বিপরীত। ইহার প্রথম, তৃতীয়, ষষ্ঠ, নবম ও দ্বাদশ লঘু; অবশিষ্ট বর্ণগুলি গুরু। যথা,

দুখে ডাকি তোমা সখে তাই হে না,
সহেনা সহেনা সহেনা সহেনা।

অথবা—

অদূরে মহারুদ্র ডাকে গভীরে।
অরে রে অরে দক্ষ দেরে সতীরে॥

উপরি-উক্ত (২ ও ৩) দুইটী ছন্দই অতি দুরূহ। মাত্রা ও লঘু গুরু ক্রম রক্ষাপূর্ব্বক গুণ, ভাব রক্ষা করিয়া রসময়ী কবিতা রচনা করা সামান্য কবির সাধ্যায়ত্ত নহে।

বাঙ্গালায় মিত্রজগতীছন্দ নানা আকারে এক্ষণে প্রচলিত দৃষ্ট হয়।

১। জলোদ্ধত গতির ন্যায় ইহার প্রথম ও তৃতীয় এবং দ্বিতীয় ও চতুর্থ চরণে অন্ত্য মিল আছে। যথা,

(১) অদূরে হিমাদ্রি তুহিন শিখর,
শুভ্র ধবলিত নিয়ত নীহারে
সাজিয়া উঠিছে উত্তর-উত্তর,
ধরিতে অরুণে স্বর্ণ-পুরোদ্বারে।

(২) ইহাও জলোদ্ধত গতির অনুরূপ। ইহার প্রত্যেক শ্লোক বা কবিতা ছয় চরণে সম্পূর্ণ। যথা,

অসীম জলধি অনন্ত পাথার,
সুধাংশু পরশে উঠিছে উথলে,
টল টল বীচি—আলবাল ধার,
বেলা বিলুণ্ঠিয়া বুলে কলকলে।
অগণ্য কৌস্তভ চন্দ্রবিম্ব ভাসে।
ভাণ্ডার খুলিয়া রত্নাকর হাসে।

(৩) প্রথিণীর ন্যায় তৃতীয় চরণের পদাংশদ্বয়ের পরস্পর অন্ত্য মিল আছে। যথা,—

সাঙ্গ জীবনের দ্বিতীয় অধ্যায়।
মর্ত্ত্য অভিনয় শেষ হয় প্রায়!

কাল পারাবারে অনন্ত পাথারে
উনপঞ্চাশৎ বর্ষ ভেসে যায়।

(৪) অষ্ট চরণে শ্লোক সম্পূর্ণ। যথা

আর কাঁদিব না! কেন বিলাপন?
কিসের বিরহ ভয়?
অতি প্রিয়তম প্রাণ কি কখন
কা'রো দরশন হয়?
প্রাণরূপে আছ প্রাণ-নিকেতনে,
কেমনে হেরিব এ পাপ নয়নে?
যবে দেহভার খসিবে আবার
মিশিব দুজনে অনন্ত জীবনে।

(৫) অষ্টাধিক চরণে শ্লোক সম্পূর্ণ, কিন্তু বিশেষরূপে নিয়মিত নহে। ইহা ইংরাজি বিকৃত ছন্দের অনুকরণ ভিন্ন আর কিছুই নহে। যথা,

এই কৃষ্ণবর্ণ জাতি পূর্ব্বে যবে
মধুমাখা গীত শুনাইত ভবে,
স্তব্ধ বসুন্ধরা শুনি বেদগান
অসাড় শরীরে পাইল পরাণ,
পৃথিবীর লোক বিস্ময়ে পূরিয়া
উৎসাহ হিল্লোলে সে ধ্বনি শুনিয়া
দেবতা ভাবিয়া স্তম্ভিত রহে।
এই কৃষ্ণবর্ণ জাতি সে যখন
উৎসবে মাতিয়া করিত ভ্রমণ,
শিখরে শিখরে জলধির জলে,
পদাঙ্ক অঙ্কিত করি ভূমণ্ডলে,
জগত ব্রহ্মাণ্ড নশ্বর দর্পণে
খুলিয়া দেখাত মনুজসন্তানে,
অমর হুঙ্কারে কাঁপিত অচল,
নক্ষত্র অর্ণব আকাশমণ্ডল,
এখন তাহারা ঘৃণিত নহে।

ত্রয়োদশাক্ষরাবৃত্তি। অতিজাতী।

কলহংস ছন্দের অনুরূপ। ইহার ষষ্ঠ ও ত্রয়োদশ বর্ণের পর যতি পড়ে। যথা,

কেহ বলে শিব, শিবানী বলে কেহ
কেহ বলে আত্মা, চৈতন্য বীত-দেহ,
নিরাকার যদি, সাকার তবু মানি,
রূপহীন ধ্যানে দেখিবে কিবা জ্ঞানী?

চতুর্দ্দশাক্ষরা বৃত্তি। শর্করী।

সংস্কৃত শর্করী নানা প্রকার, কিন্তু বাঙ্গালায় একমাত্র পয়ার ছন্দই প্রচলিত আছে। ইহা সংস্কৃত কোন ছন্দেরই অনুরূপ নহে। কারণ সংস্কৃত সকল ছন্দই লঘু গুরু ক্রমে প্রবন্ধিত। যতি বন্ধনানুসারে পয়ার ছন্দ কতকটা বসন্ত তিলকের অনুরূপ। ক্বচিৎ অপরাজিতা ও অন্যান্য সপ্তমবর্ণান্ত যতি-বিশিষ্ট ছন্দের ন্যায়ও বিরচিত দৃষ্ট হয়। সমুদয় দ্বিপদী ছন্দের মধ্যে পয়ারই প্রধান ছন্দ এবং বহুলরূপে ব্যবহৃত। তথাপি অতি অল্প কবিই ইহার নিয়ম সকল সম্যক্‌রূপে পালন করিতে সক্ষম। বর্ণবিন্যাসের গুণে ও নিয়মিত যতিক্রমেই কবিতা সুশ্রাব্য ও মধুর। সচরাচর পয়ার ছন্দ দুই চরণে সম্পূর্ণ হয়। ইহার প্রত্যেক চরণে চতুর্দ্দশটী বর্ণ আছে এবং প্রত্যেক চরণ আবার চারি ভাগে বিভক্ত। অষ্টম, সপ্তম, কখন কখন বা ষষ্ঠ বর্ণের পর যতি রাখিয়া পদাংশ বিভক্ত করিতে হয়। ইহার অন্যথা হইলেই যতিভঙ্গ দোষ ঘটিয়া থাকে। রোমীয় চিহ্ন ব্যবহার দ্বারা শ্লোক দুই চরণের অধিক বিস্তৃত হইলে বিশেষ হানি

নাই, কিন্তু নিয়মিত যতি দ্বারা পদাংশ বিভাগ করা আবশ্যক।

১। বসন্ততিলকের অনুরূপ। অষ্টম ও চতুর্দ্দশ বর্ণের পর যতি। যথা,

জগতের সার বস্তু জনক জননী,
একের অভাবে হয় আঁধার অবনী।

২। অপরাজিতা বা নান্দীমুখীর ন্যায়। সপ্তম ও চতুর্দ্দশ বর্ণে যতি। যথা,

আর আর গৃহীর গৃহিণী আছে যারা।
কত মতে স্বামীর সেবন করে তারা॥
অনির্ব্বাহে নির্ব্বাহ করয়ে কত দায়।
আহা মরি, দেখিলে চক্ষের পাপ যায়॥

৩। ষষ্ঠ বর্ণের পর যতি। যথা,

মহা ভয়ঙ্কর প্রলয়ের মহাকাল,
বিনাশে সংসার বিস্তারিয়া অগ্নিজাল।

ওজোগুণব্যঞ্জক গাঢ়বন্ধ কবিতায় এরূপে পয়ারের ব্যবহার দৃষ্ট হয়।

(ক্রমশঃ)

ভারতীয় পুণ্য নদী।

উপক্রমণিকা।

পুণ্যভূমি ভারতবর্ষের সকল স্থানই পুণ্যময় এবং সকলই পুণ্যকীর্ত্তির আধার। ইহার জনপদ আশ্রমপদ; অচল অরণ্য সিন্ধু হ্রদ; নদী সরোবর; নগর ক্ষেত্র; গ্রাম ধাম ও বৃক্ষতল পর্য্যন্ত পুণ্যস্থান ও পুণ্যতীর্থ মধ্যে পরিগণিত। যথা,

দণ্ডকারণ্য, নৈমিষারণ্য প্রভৃতি পুণ্যারণ্যানী*; ভাণ্ডীর কাম্যবন প্রভৃতি পুণ্যবনস্থলী; বরাহক্ষেত্র কুরুক্ষেত্র প্রভৃতি পুণ্যক্ষেত্র; ব্রহ্মাবর্ত্ত প্রভৃতি পুণ্য প্রদেশ; নীলাচল হৈমবত প্রভৃতি পুণ্য পর্ব্বত; অগস্ত্যাশ্রম প্রভৃতি পুণ্যাশ্রম; বৃন্দাবন, বারাণসী প্রভৃতি পুণ্য-ধাম; পুষ্কর, পৃথূদক প্রভৃতি পুণ্যস্থলী, হরদ্বার, প্রভাস প্রভৃতি পুণ্যতীর্থ এবং গঙ্গা যমুনা প্রভৃতি পুণ্যনদী নামে চিরপ্রসিদ্ধ। ভূরি ভূরি তীর্থস্থান, পীঠস্থান ও পুণ্যস্থান নিবন্ধন ভারত পৃথিবীর শ্রেষ্ঠ অঙ্গ পুণ্য-ভূমি বলিয়া প্রকীর্ত্তিত। এই সমস্ত পুণ্যতীর্থ ও পুণ্যস্থান প্রায় পুণ্যনদী সকলের উপরেই প্রতিষ্ঠিত; সুতরাং পুণ্য নদীর সংযোগে পুণ্যতীর্থের আবির্ভাব অথবা পুণ্যতীর্থের সংস্পর্শে পুণ্যনদীর মাহাত্ম্য—ইহা নির্ণয় করা সুকঠিন। অনেক পুণ্যতীর্থ পুণ্যশ্লোক মহাত্মাদিগের তপঃপ্রভাবে সৃষ্ট হইয়াছে। পুরাণ পাঠে অবগত হওয়া যায় যে, কাশীস্থ প্রসিদ্ধ চক্রতীর্থ (মণিকর্ণিকা) গঙ্গার আবির্ভাবের পূর্ব্বেও বর্ত্তমান ছিল। শেষোক্ত তীর্থ সকল সাধারণ তীর্থের অতিরিক্ত। ইহাদিগের সংখ্যাও অল্প। তীর্থ শব্দের ব্যুৎপত্তি ;—[তৃ—গমন করা + থ প্রঃ]

* অধুনা জনপদে পরিণত হইয়াছে। স্কন্দ পুরাণ কাশীখণ্ড, দেখ।

—পাপমুক্তির জন্য লোকেরা যথায় গমন করে। সচরাচর জলাবতরণিকা অর্থাৎ ঘাটকেই তীর্থ বুঝায়। তীর্থফল প্রায় স্নানেই উপলব্ধ হয়, সুতরাং তীর্থ সকল সিন্ধু, হ্রদ, নদী বা জলাশয়ের উপরেই প্রতিষ্ঠিত; বিশেষতঃ দেশ নদীমাতৃক হওয়াতে সকল নদীই পুণ্যময়ী বা পুণ্যদায়িনী বলিয়া প্রকীর্ত্তিত হইয়াছে। তন্মধ্যে গঙ্গা যমুনা গোদাবরী সরস্বতী নর্ম্মদা, সিন্ধু ও কাবেরী এই সমস্ত স্রোতস্বতী সমধিক পুণ্যশালিনী। ইহারাই প্রথম শ্রেণীর পুণ্যনদী। ব্রহ্মপুত্র প্রথম শ্রেণীর নদ হইলেও ইহা পুণ্য নদীর মধ্যে গণনীয় নহে। যমুনার ন্যায় ইহা করদ নদী বা উপনদী না হইলেও ইহা প্রধানতঃ আর্য্যাবর্ত্তের সীমান্ত-প্রদেশে প্রবাহিত হওয়াতে "পুণ্যনদ" উপাধি প্রাপ্ত হইতে পারে নাই। ইহারও বিশেষ বিশেষ স্থলে বিশেষ বিশেষ তিথি-সংযোগে যে তীর্থের আবির্ভাব হইয়া থাকে, তাহা যথাস্থানে বর্ণিত হইবে। পাপঘ্নী, ধৌতপাপা, বৈতরণী, চন্দ্রভাগা, প্রভৃতি কয়েকটী স্রোতস্বিনী দ্বিতীয় শ্রেণীর পুণ্যনদী। অবশিষ্ট প্রধান অপ্রধান সমস্ত নদ নদীই তৃতীয় শ্রেণীভুক্ত। দুর্ম্মতি, কীর্ত্তিনাশা, কর্ম্মনাশা প্রভৃতি কতকগুলি পাপ নদীও আছে। ইহাদিগেরও বিশেষ বিবরণ যথাস্থানে বর্ণিত হইবে। এই সুখপাঠ্য প্রবন্ধ সঙ্কলনে পুরাণ, ইতিহাস, জনশ্রুতি, ভূগোল, স্থানীয় কিম্বদন্তী বা প্রবাদও অন্যান্য বিশ্বাস্য বিবরণ সকলের সাহায্য গৃহীত হইয়াছে। সাধারণের অবগতির জন্য অনেক প্রয়োজনীয় ও জ্ঞাতব্য বিষয় সকলও সংক্ষেপে বিবৃত হইয়াছে। আশা করি এতৎ পাঠে অনেকেরই কৌতূহল ও অনুসন্ধিৎসা উদ্দীপ্ত হইতে পারিবে।

প্রথম অধ্যায়।

১। পুণ্যনদী গঙ্গা।

গঙ্গা, যমুনা, গোদাবরী, সরস্বতী, নর্ম্মদা সিন্ধু ও কাবেরী এই সকল প্রথম শ্রেণীর পুণ্যনদী হইলেও পুণ্যতোয়া গঙ্গা সর্ব্বশ্রেষ্ঠ ও পরম পবিত্র বলিয়া উক্ত হইয়াছে। "মা" শব্দের ন্যায় "গঙ্গা" শব্দটিও সদ্ভাব ও পবিত্রতাপূর্ণ। ভারতীয় অনেক নদীই গঙ্গা নামান্ত হইয়া পুণ্যতোয়া বলিয়া প্রসিদ্ধ হইয়াছে। যথা সরস্বতী-গঙ্গা, গণেশগঙ্গা, বিষ্ণুগঙ্গা, ঋষিগঙ্গা, কালীগঙ্গা, নারদগঙ্গা, পাতালগঙ্গা, কর্ণ-গঙ্গা, রামগঙ্গা, বাণগঙ্গা ইত্যাদি। গঙ্গার ন্যায় পুণ্য নদী আর দ্বিতীয় নাই। রামায়ণ, মহাভারত, পুরাণ, আগম প্রভৃতি গ্রন্থ সকল ইহার মাহাত্ম্য কীর্ত্তন করিয়া শেষ করিতে পারে নাই। কত স্তোত্র, কত সঙ্গীত, কত নামাবলী গঙ্গার মাহাত্ম্য ও গুণাবলী কীর্ত্তন করিয়া বিরচিত হইয়াছে তাহার সংখ্যা নাই। বাল্মীকি, ব্যাস, শঙ্করাচার্য্য, তুলসীদাস প্রভৃতি মহাত্মা ও ভগবদ্ভক্তগণ নানা ছন্দে গঙ্গা স্তব করিয়া তৃপ্ত হইতে পারেন নাই—"বিষ্ণুপাদার্ঘ্যসম্ভূতে" "শঙ্করমৌলি-নিবাসিনিবিমলে" ইত্যাদি। স্বর্গের "মন্দা-

কিনী"—পাতালের "ভোগবতী" সগর-বংশের উদ্ধারচ্ছলে গঙ্গারূপে অবনীতলে অবতীর্ণ হইয়া ভারতের পরিত্রাণ সাধন করিতেছেন। ভক্তকণ্ঠ-নিঃসৃত উদার স্তোত্র "মাতঃ শৈলসুতে!" অথবা শঙ্করের প্রমত্ত উদগীত স্তোত্রমালা—

"নরকনিবারিণি জাহ্নবী গঙ্গে,
কলুষবিনাশিনি মহোর্ম্মিতুঙ্গে,
পরিলসদঙ্গে পুণ্যতরঙ্গে,
জয় জয় জাহ্নবি করুণাপাঙ্গে।
ইন্দ্রমুকুট-মণিরাজিত-চরণে,
সুখদে শুভদে সেবকশরণে!
রোগং শোকং পাপং তাপং
হর মে ভগবতি কুমতিকলাপং
ত্রিভুবনসারে বসুধাহারে
ত্বমসি গতির্ম্মম খলু সংসারে!"

ইত্যাদি হৃদয়স্পন্দিনী গাথা সকল অতি আদরের সামগ্রী। গঙ্গামাহাত্ম্যে আরও উক্ত হইয়াছে, যথা—

"গঙ্গাগঙ্গেতি যো ব্রূয়াৎ যোজনানাং শতৈরপি।
মুচ্যতে সর্ব্বপাপেভ্যো বিষ্ণুলোকং স গচ্ছতি॥"

অর্থাৎ শত যোজন হইতেও "গঙ্গা গঙ্গা" বলিলে সর্ব্বপাপমুক্ত হইয়া বিষ্ণু-লোকে গমন করে। সুরধুনী স্বর্গঙ্গা সুরগণের বন্দনীয়া এবং সুরসেবী দেবর্ষি-গণই তদ্গুণ সংকীর্ত্তনের অধিকারী। কিন্তু আমরা পৃথিবীর মানব। আমাদের সে আশা নাই, সুতরাং আমরা পৃথিবীর গঙ্গার উৎপত্তি, গতি ও সাগরসঙ্গম স্থানের বিবরণই কীর্ত্তন করিব।

পৌরাণিক আখ্যান।

একদা বৈকুণ্ঠধামে মহোৎসব উপলক্ষে শ্রীবিষ্ণুর দিব্যালয়ে দেবগণের এক মহতী সভার অধিবেশন হইয়াছিল। স্বয়ং সদা-শিব প্রকাণ্ড তানপূরা হস্তে সপ্তমস্বরে রুদ্রতানে তাণ্ডব নৃত্য সহকারে মেঘরাগে গোলোক কাঁপাইয়া পঞ্চমুখে মহাসংগীত আরম্ভ করিলেন। সংগীত শ্রবণে সভাস্থ দেবগণ পরিমুগ্ধ ও স্তম্ভিত হইলেন এবং স্বয়ং বিষ্ণু লক্ষ্মীসহ বিমোহিত হইয়া দ্রব হইয়া গেলেন। গলিতধারা দেহ আপ্লাবিত করিয়া "পদাঙ্গুষ্ঠবিনির্গত" হইয়া ভূমে নিপতিত হয়। এমন সময় লোক-পিতা-মহ ব্রহ্মা শশব্যস্ত হইয়া স্বীয় কমণ্ডলু পাতিয়া তৎক্ষণাৎ তাহা ধারণ করিয়া লইলেন। মোহমুক্ত দেবগণ জয়ধ্বনি করিয়া উঠিলেন এবং দ্রবময়ী পূতসলিলা "সুরধুনী গঙ্গা" বা "অঙ্ঘ্রিজা" নামে অভি-হিতা হইলেন। কিন্তু বিষ্ণুপাদাঙ্ঘ্রিসম্ভূতা গঙ্গা এইরূপে কিছুকাল কমণ্ডলুবদ্ধা হইয়া ব্রহ্মলোকে অবস্থিতি করিতে লাগিলেন। অনন্তর কপিল মুনির ক্রোধোদ্দীপন করিয়া সগররাজের ষষ্টিসহস্র পুত্র ভস্মসাৎ হইলে তাহাদিগের উদ্ধারের জন্য তদ্বংশধর মহা-রাজ ভগীরথ বিস্তর কঠোর তপস্যা করিয়া ব্রহ্মার নিকট হইতে পুণ্যতোয়া গঙ্গাকে প্রাপ্ত হন। পাছে ব্রহ্মলোক হইতে বি-পতনের সময় জলপ্রপাতাঘাতে পৃথিবী শতধা বিদীর্ণ হইয়া রসাতলস্থ হয়, এই ভয়ে বিরাটরূপী ভগবান ব্যোমকেশ স্বীয় জটা-ভার বিস্তার করিয়া ধারাসমস্ত মস্তকে

ধারণ করিলেন; এই জন্য তাঁহার নাম গঙ্গাধর। তৎপরে বেগ মন্দ হইলে পৃথিবীতে অবতরণপূর্ব্বক ক্রমে সগর-বংশের উদ্ধার সাধন করিয়া তরঙ্গিণী গঙ্গা-সাগরে সম্মিলিত হইলেন। পথি-মধ্যে কেবল দুইটী মহা বিঘ্ন উপস্থিত হয়। তন্মধ্যে একটা কুরুরাজপুত্র রাজর্ষি জহ্নু তপশ্চর্য্যাপরায়ণ হইয়া তপোবন মধ্যে স্বায় পর্ণকুটীরের সমীপে সমাবিস্থ ছিলেন, গর্ব্বিতা গঙ্গা তাঁহাকে অতিক্রম করিয়া তাঁহার পর্ণকুটীর ও কোশাকুশী তরঙ্গ-বেগে ভাসাইয়া লইবার অপরাধে তদ্দণ্ডেই এক গণ্ডুষে তৎকর্ত্তৃক পীত হইয়াছিলেন। মহা বিপদ! ভগীরথ ভাবিয়া অস্থির! পরিশেষে অনেক সাধ্যসাধনা করাতে কৃপালু মুনি স্বীয় জানু বিদীর্ণ করিয়া পুনর্ব্বার গঙ্গাকে বাহির করিয়া দেন। উচ্ছিষ্টাশঙ্কায় তিনি উদ্গিরণ করেন নাই বলিয়া গঙ্গা কৃতজ্ঞতাসহকারে তাঁহাকে অভিবাদন করেন এবং তাঁহার কন্যা বলিয়া আত্মপরিচয় প্রদান করেন। তাই তাঁহার অপর নাম জাহ্নবী অর্থাৎ জহ্নু কন্যা।* অপর বিঘ্নটী অপেক্ষা-কৃত কৌতুকাবহ। গঙ্গা গৌড় অতিক্রম করিয়া প্রবলবেগে প্রবাহিত হইতেছেন, ভগীরথ অগ্রে অগ্রে পথপ্রদর্শক হইয়া গমন করিতেছেন, সহসা পদ্মমুনির সহিত সাক্ষাৎ। তিনি পূর্ব্বাভিমুখে গমন করিতেছেন। ভগীরথ দক্ষিণাভিমুখী হইলেন। কিন্তু গঙ্গা ভগীরথবোধে পদ্ম মুনিকেই অনুসরণ করিলেন। বিষম বিপদ উপস্থিত। ভগীরথ কান্দিয়া আকুল। গঙ্গার ভ্রম ভঞ্জন হইল। তিনি ফিরিয়া দক্ষিণবাহিনী হইলেন বটে, কিন্তু ক্রোধে অধীরা হইয়া পদ্মমুনির অনুগামিনী পূর্ব্ব-বাহিনী প্রবাহিণীকে অভিসম্পাত করিলেন যে, তাহার মুক্তিপ্রদ শক্তি থাকিবে না। আপনার ত্রুটি ক্ষালন জন্য অপরকে অভি-শাপ দেওয়া সামান্য কৌতুকাবহ নহে। তবে পদ্মমুনি যদি ভগীরথের বেশ ধরিয়া ছলনাপূর্ব্বক গঙ্গাকে পথভ্রষ্ট করিয়া থাকেন, তবে তিনিই নিন্দার্হ। যাহা হউক পদ্ম মুনি অনুগামিনী প্রবাহিণীকে আশ্বস্ত করিয়া 'পদ্মা' নামে অভিহিত করিলেন। দক্ষিণবাহিনী গঙ্গা ভগীরথের অনুগমন করিয়া ভাগীরথী নাম প্রাপ্ত হইলেন। ব্রহ্মলোক বা স্বর্গলোক হইতে নিপতিত হইয়া গঙ্গা হিমালয়ের যে স্থল ভেদ করিয়া পৃথিবীতে প্রবাহিত হইতেছে, সেই স্থলই "গোমুখী" বলিয়া প্রসিদ্ধ। নিরবচ্ছিন্ন নিহাররাশির দ্বারা সমাচ্ছন্ন থাকাতে গোমুখী দুর্গম ও দুর্দ্দর্শনীয়। ইহার চারি ক্রোশ উত্তরপশ্চিম গঙ্গোত্রী এখন গঙ্গার উৎপত্তি স্থান বলিয়া প্র-কীর্ত্তিত। পর অধ্যায়ে ভৌগোলিক বৃত্তান্তে ইহার বিশেষ বিবরণ প্রকটিত হইবে। (ক্রমশঃ)

*জানুদ্বারা পুনরাদত্তাং জহ্নুঃ সংপীয় কোপতঃ।
জহ্নু কন্যা-স্বরূপাচ জাহ্নবী তেন কীর্ত্তিতা॥

বনবাসিনীর পত্র।

বনযাত্রার বিবরণ।

জবট শ্রীমতী রাধিকাজীউয়ের শ্বশুরালয়। এ স্থানটীর তত সৌন্দর্য্য দেখা যায় না। ইহা সামান্য একটী গ্রামের মত। এখানে কিশোরীকুণ্ড, জটিলাকুণ্ড, পাক্কলগঙ্গা নামক কয়েকটী কুণ্ড এবং দাউজী, গোপালজী, জটিলা, কুটিলা, আয়ান ঘোষ এবং শ্রীশ্রীরাধাকৃষ্ণ বিগ্রহ দর্শন আছেন। এখানে একদিন বাস করিয়া কোকিলা নামক একটি মনোহর বনের মধ্যে বহুক্ষণ যাত্রা স্থাপিত হইল এবং তথায় গোঁসাইজী রাসলীলা আরম্ভ করিলেন। এই বনে নির্ম্মল বারিপূর্ণ একটী কুণ্ড আছে এবং বনবেহারী নামক ৺রাধাকৃষ্ণের মূর্ত্তি, একটী শিবলিঙ্গ ও শনিদেবের মূর্ত্তি এবং মহাপ্রভুর বৈঠক আছে। এ বনটীও নানাবিধ কুসুমপূর্ণ, ভ্রমরকুল-ঝঙ্কারিত, পিককুলনিনাদিত এবং শারীশুক ময়ূর-ময়ূরী প্রভৃতি বিবিধ নয়নমনোহারী বিহঙ্গমদলের সুন্দর দৃশ্যে সুশোভিত। এখান হইতে বটান নামক এক স্থানে এক রাত্রি বাস করা হইল। ছোট বটান এবং বড় বটান নামক একত্র সংলগ্ন দুইটী গ্রামের নাম বটান। ব্রজবাসিগণ বলেন "কৃষ্ণ এবং বলদেব দুই ভাই এই দুইটি গ্রাম বসাইয়াছিলেন। বড় বটানে বলভদ্র কুণ্ড এবং বলদেবজী দর্শন আছে এবং ছোট বটানে কৃষ্ণকুণ্ড এবং ৺রাধাকৃষ্ণের মূর্ত্তি দর্শন আছে। এখান হইতে রাস-কুণ্ড নামক একটী কুণ্ড এবং একটি সুন্দর বনমধ্যে আবার একটি চরণপাহাড়ী দর্শন আছে। এখানে শ্রীকৃষ্ণের চরণ-চিহ্ন ভিন্ন গো, মহিষ, উষ্ট্র প্রভৃতি পশুরও পদচিহ্ন লক্ষিত হয়। এই ক্ষুদ্র পাহাড়-জাত চরণগঙ্গা নামক ক্ষুদ্র পুষ্করিণীর ন্যায় জলাশয়ে স্নানাদি করিয়া তথা হইতে দেহ নামক গ্রাম এবং ব্রজভূষণ নামক বিগ্রহ দর্শন ও মদন গোপালকুণ্ড, দধি-কুণ্ড, ভূষণকুণ্ড, ভামিনীকুণ্ড নামক চারিটি কুণ্ড অতিক্রম করিয়া কুটবন নামক স্থানে একদিন যাত্রা রহিল। এখানে শীতলকুণ্ড নামে কেবল একটি কুণ্ড এবং ৺রাধাকৃষ্ণ বিগ্রহ দর্শন আছে। এখান হইতে যাত্রা করিয়া সূর্য্যকুণ্ড, লক্ষ্মীকুণ্ড এবং একটি গ্রাম পার হইয়া শেষশাই নামক স্থানে যাত্রা গেল। এখানে ক্ষীরোদ সমুদ্র নামক অতি প্রশস্ত দীর্ঘাকার একটী কুণ্ড আছে এবং অনন্তশয্যায় শায়িত অনন্তদেবের মূর্ত্তি, শ্রীশ্রীরাধাকৃষ্ণ বিগ্রহ, দুইটি শিব-মন্দির এবং ক্ষীরসাগর পারে ৺ মহাপ্রভুর বৈঠক দর্শন আছে। এই ক্ষীর সাগরের জল পূর্ব্বে অতিশয় সুমিষ্ট ছিল শুনা যায়; কিন্তু এক্ষণে ভয়ানক লবণময় হইয়াছে। এখানে স্নান দর্শনাদি করিয়া বোথ্‌রাইয়ে একটি কুণ্ড এবং দাউজী দর্শন আছে।

এখান হইতে একটি গ্রাম এবং খেলানবন নামক যমুনাতীর সংলগ্ন একটি সুন্দর বনের মধ্য দিয়া সেরগড় নামক স্থানে যাত্রা স্থাপিত হইল। সেরগড় একটি প্রাচীন বন্দর বলিয়া বোধ হয়। পূর্ব্বে ইহা অতি সমৃদ্ধিমান ছিল। এখনও অনেক বৃহৎ বৃহৎ ভগ্ন অট্টালিকা এবং কেল্লা ও গড়ের চিহ্নাদি দৃষ্টিগোচর হয়। এখানে দাউজী, গোপীনাথজী, বেহারীজী প্রভৃতি কতিপয় সুন্দর সুন্দর বিগ্রহ দর্শন আছেন এবং কৃষ্ণকুণ্ড নামক একটি কুণ্ড আছে। এখানে একদিন বাস করিয়া একটি ক্ষুদ্র গ্রামের মধ্য দিয়া যমুনার ধারে চীরঘাট নামক স্থানে যাত্রা স্থাপিত হইল। এখানে কাত্যায়নী দেবী, একটি শিবলিঙ্গ, ৺মহাপ্রভুর বৈঠক এবং শ্রীশ্রী-রাধাকৃষ্ণ বিগ্রহ দর্শন আছে। ব্রজবাসী বলেন "এখানে গোপবালাগণ কাত্যায়নী ব্রত করিয়াছিলেন এবং এই চীরঘাটই বস্ত্র হরণের ঘাট বলিয়া প্রসিদ্ধ।" আবার কেহ কেহ বলেন ৺বৃন্দাবনস্থিত চীরঘাটে বস্ত্র হরণ লীলা হইয়াছিল। যাহাই হউক পূর্ব্বোক্ত চীরঘাটে একদিন বাস করিয়া একটি ক্ষুদ্র গ্রামের মধ্য দিয়া নন্দঘাট নামক যমুনার আর একটি ঘাটে যাত্রা রহিল। ব্রজবাসিগণ বলিয়া থাকেন এই ঘাটে নন্দবাবা একাদশীর রাত্রে স্নান করিতে আসিয়াছিলেন, আর বরুণদেব তাঁহাকে হরণ করিয়া লইয়া গিয়াছিলেন। এই ঘাটে শ্রীকৃষ্ণের মস্তকের উপর হস্তাঙ্কিত নন্দবাবার প্রতিমূর্ত্তি আছে। এখানে একদিন থাকিয়া যমুনা পার হইয়া কিয়দ্দূর ভদ্রবনে হনুমানজী দর্শন করিয়া কতদূরে ভাণ্ডির বন। ভাণ্ডির বনে ছিদাম সখা, ছিদামকুণ্ড এবং ভাণ্ডির বনবেহারী, আনন্দবেহারী প্রভৃতি কয়েকটী বিগ্রহ এবং ছিদামের মুকুট দর্শন আছে। এখান হইতে খানিক দূরে যমুনার ধারে বেলবন। বেলবনে শ্রীশ্রীলক্ষ্মীদেবী তপস্যা করিতেছেন এরূপ একটি প্রতিমূর্ত্তি এবং ৺মহাপ্রভুর বৈঠক আছে। বেলবনে প্রতি বৎসরের পৌষ মাসে বৃহস্পতি এবং রবিবারে ৺লক্ষ্মীদেবীর মেলা হইয়া থাকে। তাহাতে অসংখ্য যাত্রী মিলিত হইয়া ৺লক্ষ্মীদেবীর পূজাদি করিয়া থাকে এবং খিচুড়ী রন্ধন করিয়া বন্ধুবান্ধব আত্মীয়-স্বজন প্রভৃতি লইয়া মহানন্দে বন্য ভোজন করে। যমুনার এক পারে বেলবন, অপর পারে ৺বৃন্দাবন। আমরা বেলবনে আসিয়া ৺বৃন্দাবন ধাম এবং তৎসঙ্গে আমাদের ক্ষুদ্র কুটির দেখিতে পাইয়া আনন্দ লাভ করিলাম। পরে যাত্রীদল যমুনা পার হইয়া ৺বৃন্দাবনধামের কেয়ারী বনে দাবানল নামক কুণ্ডের ধারে যাত্রা স্থাপিত করিল।

(ক্রমশঃ।

নূতন সংবাদ।

১। ভারতসম্রাট্ ৭ম এডওয়ার্ড সস্ত্রীক ইউরোপের নানা দেশ পরিভ্রমণপূর্ব্বক মহাসম্মান লাভ করিয়া রাজধানীতে প্রত্যাগত হইয়াছেন।

২। গত এপ্রেল মাসে কুচবিহারের মহারাজা ও মহারাণীর দাম্পত্য জীবনের ২৫ বৎসর পূর্ণ হওয়ায় রৌপ্য বিবাহানুষ্ঠান হইয়াছে এবং জ্যেষ্ঠ মহারাজকুমার যৌবরাজ্যে অভিষিক্ত হইয়াছেন। এই উভয় শুভানুষ্ঠান উপলক্ষে মহা সমারোহ হইয়াছিল। জগদীশ্বর রাজদম্পতী এবং কুমারকে দীর্ঘজীবী করিয়া সুখী করুন্।

৩। ভাগ্যকুলের জমীদার বাবু হরেন্দ্র নাথ রায় ঢাকা মিটফোর্ড হাসপাতালে একটী ঔষধালয়ের জন্য ২৪ হাজার টাকা দান করিয়াছেন।

৪। রুসিয়ার রাজধানী সেণ্টপিটার্সবর্গ ২০০ বৎসর পূর্ব্বে প্রতিষ্ঠিত হইয়াছিল, ইহার স্মরণার্থ ২৯এ ও ৩০এ মে উৎসব হইয়া গিয়াছে।

৫। আমেরিকার সুপ্রসিদ্ধ ধর্ম্মাচার্য্য এমার্সনের স্মরণার্থ গত ২৫ এ মে আমেরিকানেরা মহা সমারোহে তাঁহার শতবার্ষিক জন্মোৎসব করিয়াছেন।

৬। কর্ণেল ইয়েট নামক এক ইংরাজ গুপ্তচর বলিয়া আফগানস্থানে ধৃত ও বন্দী হইয়াছিলেন। আমীর ইংরাজরাজের সহিত সদ্ভাব রক্ষার্থ তাঁহাকে মুক্তি দিয়াছেন।

৭। ভবনগরের মহারাজা স্বীয় জন্মোৎসবে রাজ্যের প্রত্যেক বিশ্ববিদ্যালয়ের ছাত্রকে এক এক খানি পুস্তক উপহার দিয়াছেন, কয়েকটি ছাত্রবৃত্তি ঘোষণা করিয়াছেন এবং তেত্রিশ জন বিধবাকে আজীবন মাসিক তিন টাকা বৃত্তি দিবার ব্যবস্থা করিয়াছেন।

৮। বঙ্গের প্রসিদ্ধ কবি বাবু হেমচন্দ্র বন্দ্যোপাধ্যায়ের মৃত্যুসংবাদে আমরা বিশেষ দুঃখিত হইলাম। তিনি একজন প্রকৃত দেশহিতৈষী এবং নারীসুহৃদ ছিলেন। তাঁহার রচিত ভারত-সংগীত এবং হিন্দু বিধবা এবং কুলীন কন্যাদিগের দুরবস্থার চিত্র পাঠ করিলে শরীর কণ্টকিত হয়। ঈশ্বর তাঁহার আত্মার কল্যাণ বিধান করুন।

৯। গত ২২শে মে বরিশাল জেলা ইস্কুলের গৃহে বাখরগঞ্জ হিতৈষিণী সভার বার্ষিক পরীক্ষোত্তীর্ণ মহিলা ও বালিকাদিগের পারিতোষিক বিতরণ হইয়া গিয়াছে। বেল সাহেব সভাপতির কার্য্য করিয়াছেন।

১০। এ বৎসর বিশ্ববিদ্যালয়ের এণ্ট্রান্স পরীক্ষায় ৩২৬১, এফ এ পরীক্ষায় ১৩২১ এবং বি এতে পাস ৭৮ এবং অনর ৩৬২ উত্তীর্ণ হইয়াছে।

বিশ্ববিদ্যালয়ের পরীক্ষোত্তীর্ণা স্ত্রীলোকগণের নাম :—

বি, এ।

মিত্র কুমুদিনী	বেথুন কলেজ
রায় প্রভাবতী	ঐ

এফ, এ।

প্রথম বিভাগ।

মুখোপাধ্যায় সুরবালা	বেথুন কলেজ

দ্বিতীয় বিভাগ।

ভট্টাচার্য্য সুরমা	বেথুন কলেজ
বিশ্বাস ইন্দুপ্রভা	,,
মিত্র বাসন্তী	,,
রায় সুখলতা	,,
সিংহ ক্ষণপ্রভা	,,
জুস্থরিটা	লামার্টিনো

তৃতীয় বিভাগ।

দাস ভক্তিউষা	বেথুন কলেজ

এণ্ট্রান্স।

১ম বিভাগ।

ঘোষ নির্ঝরপ্রিয়	বাঁকিপুর বালিকাবিদ্যালয়

২য় বিভাগ।

গুহ প্রতিভা	ব্রাহ্ম বালিকা শিক্ষালয়
সেন কমলা	ইডেন ফিমেল স্কুল

৩য় বিভাগ।

বাগ্‌চী হেমন্তকুমারী	ব্রাহ্ম বালিকাবিদ্যালয়
চট্টোপাধ্যায় মধুস্রবা	বাঁকিপুর বালিকা বিদ্যালয়
দত্ত লীলাময়ী	ব্রাহ্ম বালিকাবিদ্যালয়
রক্ষিত শোভনা বালা	ইডেন ফিমেল স্কুল
গুপ্ত ললিত লীলা	লোরেটো হাউস

বামারচনা।

আবাহন-গীতি।

(নব বর্ষের প্রতি)

ওগো! তুমি এস! এস!
এ বিশ্ব রয়েছে বিধবা হয়ে,
তোমারি অভাব হৃদয়ে লয়ে,
হে মধুর! তুমি জুড়াও তারে,
সাদরে ভাল বে'স বে'স।
ওগো! তুমি এস! এস!
ওগো! তোমারি জন্য পথ চেয়ে আছে
হেথায় তমো যামিনী,
তুমি আসিলে সে পরিবে শিরে
তারকা মালা—উজল হীরে,
চন্দ্রমা হাসিবে মধুর ধীরে,
সাজিবে রাজ-ভামিনী।
পূজিবে তোমারে প্রকৃতি রাণী,
ফুটাবে কুসুম রাশি,
ছুটাবে সুবাস সুবাসবহ
নব পরিমল সুধার প্রবাহ,
যত পার সখে, তত তুমি লহ,
আনন্দে পুলকে ভাসি।
তোমারে ডাকিছে সারা ধরণী
ললিত বেহাগ তানে,

এস। এস! অয়ি নব অতিথি,
দিবে যে পরাণ ভরি পিরীতি,
হেরিবারে তব চারু মূরতি,
সাধিছে আকুল প্রাণে।

শ্রীকাব্যকুসুমাঞ্জলি রচয়িত্রী।

নববর্ষের প্রার্থনা।

দয়াময় তব পাশে এই ভিক্ষা চাই,
পাশরি অতীত দুঃখ
নব আশে ভরি বুক
ও পাপহরণ নামে পরাণ মাতাই,
নূতন বরষে দেব! যাচি আমি তাই। ১
সকাতরে মাগি আমি চরণে তোমার—
এ বিশাল ধরা পর
কারেও না ভাবি পর,
ব্যথিত কাতর চিত দুখী অভাগার
পারি যেন মুছাইতে তপ্ত অশ্রুধার। ২
এই যাচি শান্তিময় চরণে তোমার—
স্বার্থময় প্রলোভনে
সুখ ছায়া অন্বেষণে
সদা নাহি করি যেন 'আমার আমার',
না করি পরাণ যেন অশান্তি আধার। ৩
এই ভিক্ষা দয়াময় ও পূত চরণে—
তুমি দেব! মোর তরে
যে করুণা প্রাণ ভরে
বরষিছ অধম এ তৃষিত পরাণে,
না ভুলি তোমায় যেন জীবনে মরণে। ৪
চঞ্চল সরিৎসম জীবন আমার,
অনন্ত লহরী তাহে,
নাচিয়া বেড়ায় মোহে,
কিন্তু তুমি আছ দেব! সমুখে আমার,
থাকে যেন মতি স্থির চরণে তোমার। ৫
অনন্ত করুণা উৎস অনন্ত ধারায়
ঢালিছ এ ক্ষুদ্র প্রাণে,
এ জীবন অবসানে
এ পরাণ যেন দেব মিলে মিশে যায়
ত্রিদিব-বাঞ্ছিত ওই শ্রীপদ-ছায়ায়।
তোমার করুণা-ধারা শান্তি জোছনায়
পরাণ চকোর মোর
যেন হয়ে থাকে ভোর,
নির্গন্ধ তাপিত এই অপরিজিতায়
রেখো দেব নারায়ণ! ও পদ-ছায়ায়! ৭
এস গো ব্যথিত-চিত তাপিত সকলে,
পূজি সে রাজীব পদ প্রেম-অশ্রু জলে,
নূতন বরষ আজি
ওই নবরূপে সাজি
মধুরূপে ওই পুনঃ উদিল ভূতলে,
(আজি, বাঁধগো জীবন বীণা নব আশা-বলে॥

শ্রীমৃণালিনী মজুমদার।

কোথা মম গেহ।

মোর গেহ হেথা এই গিরীশের কোণে।
নির্জ্জন গহনময়! নিবিড় বিজনে॥
সৃষ্টির সর্ব্বাঙ্গময় মোর গেহ আছে।
কেন ঘুরিতেছি হায়! কুহেলিকা পাছে?
কে বলে গো এই কথা? "আমি গেহহীন"!
রাজার সন্তান হয়ে এতই কি দীন?
বিশাল জগত মাঝে আমি তাঁরি কণা।
কেবা আছে? এ কথাটী করিবে যে মানা?
হায়! তবে কেন ভাবি আমি গেহহীন।
ধূলিতে লুটাই সদা, অতীব মলিন?
আমি ত তাঁহারি হই, জগত আমার।
এ তো নয় কিছু ভুল কথাটী যে সার॥
তবু ভুলি শত বার। খুঁজি "কোথা ঘর"?
কাজ কি আমার ভেবে? কেবা আত্মপর?
এ জগত মাঝে মোর গেহ আছে শত।
তবু কেন কাঁদি সদা অবিশ্বাসী মত?
আঁধারে ডুবায়ে হায়! ভুলি যে সুপথ।
মাতৃহারা শিশুসম কাঁদি অবিরত॥
ছোট বড় আছ যত সবারি নিকটে।
আমার যে ঠাঁই আছে তাহা সব বেটে॥
অসীম ব্রহ্মাণ্ড মাঝে মোর ভাগ আছে।
আমিও যে ঠাঁই পাব সে চরণ কাছে॥
মন যে মানে না বলে "কোথা হায় গেহ"?
কে বরিষে নিশিদিন এ অতুল স্নেহ?
আমি ত তাঁহারি হাতে খেলার পুতুল।
তাঁরি বলে চলি বলি নহে কিছু ভুল॥
যত দিন পারি খেলি সুবিশাল ভবে।
ভূধর গহন সব মোর গেহ হবে॥
পরে এই ধূলি খেলা হলে অবসান।
সে অমৃতধারা মাঝে মিশিবে এ প্রাণ॥
তাই সৃষ্টিময় হেরি আমার ভবন।
সর্ব্বত্রই হেরি সেই হাত নিদর্শন॥

জনৈক মহিলা।

করুণা তোমার।

তোমারি করুণা-ধারা
ঝরে শত ধারে,
নবীন বরষে আজি
গৃহ পরিবারে।
পঙ্কিল আঁধার যাক
অতীতে বিলীন হয়ে,
হে, চির-নবীন থাক
মঙ্গল কল্যাণ লয়ে।
তোমার করুণা-ধারা
নীলিম নভোমণ্ডলে,
তোমার করুণা-ধারা
শ্যামল ধরণীতলে।
ও করুণা প্রীতিরূপে
প্রবেশে প্রবাসে গেহে,
ও করুণা শত ধারে
জননীর পূত স্নেহে।
আঁখি পরে আলো রূপে
তোমারি করুণা-ধারা,
ঝরিছে করুণা ওই
নিশায় নীহার পারা।

ফোটে ফুল করুণায়,
গাহে পাখি কল স্বরে,
মৃদুল দক্ষিণা বায়
ও করুণা গান করে।
নির্ঝরিণী বহে যায়
আলিঙ্গিতে পারাবার,
সেত আর কিছু নয়
তব কৃপা-স্রোতো-ধার।
হে চির-আরামস্থান।
হে চির-কল্যাণময়,
আকুল হৃদয়খানি
তোমাতে হারাতে চায়।
ও করুণা লয়ে বুকে,
ও করুণা লয়ে শিরে,
কঠিন জীবন পথে
চলে যাব ধীরে ধীরে।
মরণের পর পারে
অনন্ত জীবন যেথা,
হাতে ধরে যাবে লয়ে
তোমারি করুণা সেথা।

শ্রীসরলা দত্ত।

আমেরিকার পত্র।

A DESCRIPTION OF VANCOUVER.*

(From a lady).

Mt. PLEASANT,
April 28th, 1902.

To begin I will tell you something of the weather here. In winter Vancouver seems unnatural when no rain has fallen for two or three days. But the rain here is healthful and invigorating as almost every one will allow. Occasionally the monotony is varied by light falls of soft snow; this, however, soon gives place to rain again. In summer the days are very warm, but never so hot as to cause many if any, deaths. The pleasing feature of summer here is that the nights are always cool and the early morning is simply delightful in its freshness.

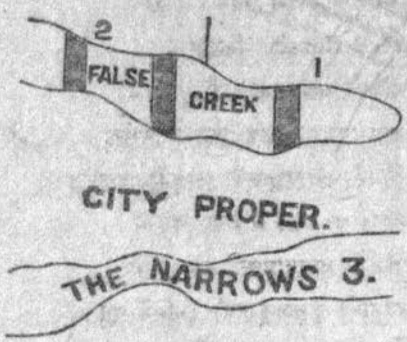
The surroundings are wild in character, which but serves to form an excellent frame for the city. Just outside the city limits the woods are perfectly wild except in that what were once huge trees have, by the action of fire, been felled and now lie covered with blackberries and other running vines. I must not forget to mention our mountains, which, covered by forests of the high Douglas firs, seemed almost to surround us.

The trees most common in the woods here are soft maple, Giant Cedar, Douglas fir, white pine and alder. The soft maples are deciduous; the wood of these trees is extremely white in color and burns well. The Giant Cedar grows to a height of about two hundred feet and the largest specimen yet discovered measures, in circumference, fifty feet. The wood of this tree is very light and much is sent to China and Japan every year, in the shape of shingle-bolts. Douglas fir is probably the most plentiful of our trees, the wood being shipped to almost every country with which Vancouver trades. The trees rival even the cedar in size. The white pine and alder are of little use except for firewood.

When I first came to this city I was impressed by its comparative cleanliness. The streets are broad and well lighed by electricity. The street railway system is visibly improving every year, and an electric tramway connects us with New Westminister, twelve miles distant.

* An island in the North Pacific Ocean off the north-western coast of British North America.

Below I will draw a small map indicating how Vancouver is laid out.



1. Mt. Pleasant; 2. Fairview; 3. Burrard Inlet standing at the head of False Creek.

The view obtained is splendid on a fine day. Three bridges connect Mt. Pleasant and Fairview to the city. When you look over Burrard Inlet, you see in the distance the Narrows, a dangerous passage, on one side of which are two small villages mainly consiting of small white cottages peopled by Indians. On the city side is Stanley Park. The sun shinhing on the blue water and the white houses with their background of dark, frowning snow-capped mountains is a fit subject for a painter, and the peace and rest inspired are too deep for words to express.

Now I have mentioned Stanley Park, I must tell something about it. The main road which leads to it from the West End, the fashionable residential part, divides and the two branches, separated by the cottage of the Park-keeper, meet again at Brockton Point. After leaving behind the various cages of wild animals and birds one is confronted not by studiously laid out walks and Primgarden Plots, but by the woods in their natural wildness, save that enough underbush has been removed to make walking easy and pleasant. Brockton Point is a rocky point jutting out into the water at the narrowest part of the Narrows. Sometimes when standing here one may watch the large Empresses ploughing their way through the water, carefully avoiding the dangerous rocks.

One subject leads to another and now I must tell about the trade these liners, the Empress of Japan, the Empress of India, and the Empress of China, carry on aided by several smaller lines of steamers. Their trade is with China, Japan, and India, while other smaller vessels carry freight to and fro these countries. The cargoes loaded here are salmon, lumber, shingle-bolts and oil for the principal part. The goods brought back consist of silk, tea, rice, lacquer work, Chinamen, and Japanese—the two last named are two things which Vancouver may well boast no lack of. Other lines connect with south America, San Fransisco, Seattle, Victoria, Nanaimo, Skagway and many less important places up the coast, not to mention Slawson in the valuable gold fields of Yukon.

Most decidedly the best, and at present only Canadian, overland route to British Columbia is the Canadian Pacific Railway. The service is excellent and the cars very comfortable. If you would like a description of a trip from Toronto to this city, *via* this railway, I could write one founded on my own experience.

The last thing I shall tell of our "Business City of British Columbia" is the school system. This is made of public schools graded from First and Second Primer classes to the Senior Fifth Reader. From this latter class an examination is tried for entrance to Vancouver College, the staff of which is at present ten teachers who have the care of ten classes and, in addition two University classes. We can also boast of a Normal School for teachers and two commercial colleges. The latest venture at the High Scool is a monthly paper to which articles contributed by the scholars are given. The next issue is to be a Souvenir, so if you desire a copy, I could send one with pleasure.

Of the latter I could write best, having intimate acquaintance with many Christians at the Vancouver Japanese Mission.

Yours truly

CLAIRE WETHERAL.

বামাবোধিনী পত্রিকা।

No 479. July, 1903.

BAMABODHINI PATRICA.

"কন্যাপ্যেবং পালনীয়া শিক্ষণীয়াতিযত্নতঃ"

কন্যাকে পালন করিবে ও যত্নের সহিত শিক্ষা দিবেক।

শ্রীউমেশচন্দ্র দত্ত, বি, এ কর্ত্তৃক প্রবর্ত্তিত ও সম্পাদিত।

৪১ বর্ষ। ৪৭৯ সংখ্যা। আষাঢ়, ১৩১০। জুলাই, ১৯০৩। ৭ম কল্প। ৪র্থ ভাগ।

সাময়িক প্রসঙ্গ।

রাজজন্মোৎসব—ভারত সম্রাট্ ৭ম এডওয়ার্ড যদিও নবেম্বর মাসে জন্মিয়াছেন, তাঁহার ইচ্ছানুসারে গত ২৬এ জুন ভারতের সর্ব্বত্র তাঁহার জন্মোৎসবোপলক্ষে আদালত ও আফিসাদির ছুটী হইয়াছে। মা ভিক্টোরিয়ার জন্মোৎসব এই বার প্রথম বন্ধ হইল!

ছাত্রীবৃত্তি—নিম্নলিখিত ছাত্রীগণ এ বৎসর বৃত্তি পাইয়াছেন ঃ—

সুরবালা মুখো	সিনিয়র	১ম	২০,	বেথুনকলেজ
সুখলতা রায়	"	২য়	১৬,	"
নির্ঝরিণী ঘোষ	জুনিয়র	১ম	১৬,	বাঁকীপুর ফি, স্কুল
নীরজাবাসিনী সোম	"	২য়	১২,	ঐ
রেণু বসু	"	৩য়	৮,	বেথুনকলেজ

নারীচরিত—মান্দ্রাজের শ্রীমতী আনা অম্বাগারু ৫ ভাষায় পারদর্শিনী। তিনি 'সুবিখ্যাত রমণীদিগের জীবনী' পুস্তক প্রকাশ করিয়াছেন।

জলদর্শন যন্ত্র—হাইড্রোস্কোপ নামে এক যন্ত্র নির্ম্মিত হইয়াছে, তাহার সাহায্যে জলমধ্যস্থ বস্তু সকল সুস্পষ্ট দেখা যায়।

সুবক্তা—ঢাকার খ্যাতনামা রায় কালীপ্রসন্ন ঘোষ বাহাদুর কলিকাতায় আসিয়া বাঙ্গালায় বক্তৃতা করিতে আরম্ভ করিয়াছেন। কলিকাতাবাসিগণ তাঁহার খুব সমাদর করিতেছেন।

ধনপোতা—ইংলণ্ডের কেণ্ট নগরের ১২৬ হাত দীর্ঘ ৮১ হাত প্রস্ত এক স্থানে পোতাধন পাওয়া গিয়াছে। অনেকে অনুমান করেন, ইহা রোমক সৈন্যদিগের পরিত্যক্ত সম্পত্তি। তাহারা ফিরিয়া আসিবে মনে করিয়া টাকা পুতিয়া রাখিয়া চলিয়া গিয়াছিল, আর ফিরে নাই।

শিশুরক্ষণী সভা—দার্জিলিঙে ছোট লাটের ভবনে ইহার সভা হয়। দুরাচারিণীদের হস্ত হইতে বালিকাদিগকে